QUEST

Uluberia College
Uluberia, Howrah-711315

QUEST

Editor

Dr. Aditi Bhattacharya

Editorial Board

Dr. Debasish Pal, Dr. Siddhartha Sankar Bhattacharya,
Sri Dipak Kumar Nath, Sm. Chandana Samanta, Dr. Uttam Purkait,
Dr. Momtaj Begam.

QUEST

Vol - 7
2012-13

Printed by :

Impression
108, Raja Basanta Roy Road,
Kolkata - 700 029

QUEST

A Bi-lingual Academic Journal
2012-13

Vol - 7

Uluberia College
Uluberia, Howrah-711315

Contents
(সূচীপত্র)

Part-I
(প্রথম পর্ব)

১। বিবেকানন্দ চিন্তনে নারী-জাগরণ ও নারী প্রগতি — ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য 1

২। Swami Vivekananda's View on Education
Dr. Aditi Bhattacharya 7

৩। স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ভারতীয় নারী — ডঃ চিত্রিতা দত্ত 14

৪। স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম ও নীতি — তরুণ গোস্বামী 20

৫। The Clarion Call — Dr. Joy Bhattacharya 27

৬। সম্প্রীতির সেতু স্বামী বিবেকানন্দ — ডঃ মমতাজ বেগম 33

৭। ঈশ্বর ভাবনা ও স্বামী বিবেকানন্দ — শুভময় পাহাড়ী 40

Part-II
(দ্বিতীয় পর্ব)

১। 'অশনিসংকেত' ঃ প্রসঙ্গ সাময়িক পত্র — বাসন্তী ভট্টাচার্য 48

২। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-নারীর বিদ্যাচর্চা ঃ সুযোগ ও সম্ভাবনা
— শুভময় ঘোষ 58

৩। কথাসাহিত্যে চরিত্র ঃ বিম্ব-প্রতিবিম্ব — উত্তম পুরকাইত 70

৪। Women and Environment - a reading of 'The Coffer Dams' and 'Nectar in a Sieve' — Soma Mandal 82

৫। আমাদের প্রগতি শিল্প-সাহিত্য ঃ একটি সীমাবদ্ধ সমীক্ষা — সুপ্রিয় ধর 88

৬। Jnanadanandini Devi : Her "Own" Voice
— Dr. Jayashree Sarkar 94

৭। Autonomous and Secessionist Movements in Indonesia
— Tuhina Sarkar 101

১৫। সার্ধশতবর্ষের রঙ্গালোকে বিনোদিনী দাসী — ডঃ নিলয় কুন্ডু

১৬। বৌদ্ধ দর্শনে পারমিতার ভূমিকা — অধ্যাপিকা জয়িতা দত্ত

১৭। Omega-3 Fatty Acids – an essential element
— Dr. Siddhartha Sankar Bhattacharya

১৮। Some Modern Methods in Mass Spectroscopy
A bi-lingual approach — Dr. Bireswar Mukherjee

১৯। Discovery of Higgs boson in LHC — Dr Lina Paria

২০। Allelopathy : Chemical Warfare in Plants - An Overview
— Dr. Supatra Sen

২১। Foreign Direct Investment in India
—Dipak Kumar Nath

rview

Editorial

"Quest"—our yearly academic journal is now eight years old. Since its inception it has been encouraged by the college authority and the faculty members. Needless to say that without the sincere effort of the faculty members and their valuable contributions it would not be possible to publish it uninterruptedly. It has been accepted with earnestness and appreciation by different quarters of the academic world. In the last year we have published some writings of the academicians outside our college who eagerly contributed their articles in our journal.

Last year our journal has been registered under ISSN which is very much encouraging for those who regularly contribute their articles in the journal. This year one part of the journal is dedicated to commemorate the 150th Birth Anniversary of Swami Vivekananda and the other part will be given to our faculty members for their academic enterprise.

We welcome our reader's criticisms and suggestions to help us assess our writings and to keep afloat our zeal of publishing the journal regularly.

Part-I
(প্রথম পর্ব)

This part is dedicated to Commemorate the 150th Birth Anniversary of Swami Vivekanada

বিবেকানন্দ চিন্তনে নারী-জাগরণ ও নারী প্রগতি

ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য

আমি নারী, আমি মহীয়সী
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্নাবীণায়
নিদ্রাবিহীন শশী
আমি নইলে মিথ্যে হ'ত সন্ধ্যা তারা-ওঠা
মিথ্যে হ'ত কাননে ফুল ফোটা

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতে নারী জাগরণ ও নারী মহিমার অপরূপ তূর্য-নিনাদ। আর এখানেই ... নারী জাতি সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের সতেজ ও সশ্রদ্ধ উক্তি ঃ "মেয়েদের ...ইসব জাতি বড় হইয়াছে। যে দেশে, যে জাতিতে মেয়েদের পূজা নাই, সে ... জাতি কখনও বড় হইতে পারে নাই, কস্মিনকালে পারিবেও না।" স্বামীজী ... বিশ্বাস করতেন যে দেশে মেয়েদের সম্পর্কে কোনও মর্যাদা-বোধ নেই, ... কখনও বড় হতে পারে না। আর একথা অবশ্য সত্য যে 'জগতের কল্যাণ, ...র অভ্যুদয় না হইলে সম্ভবনা নাই।'

শ্রী রামকৃষ্ণের উত্তরসূরি স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য, সভ্যতা ...তি এবং ভাবধারায় পুষ্ট হয়ে সমগ্র বিশ্বকে এক নতুন দিগন্তে উদ্ভাসিত ...। ভারতের সন্ন্যাসীবৃন্দ সাধন পথেরপ্রতিবন্ধক জ্ঞানে চিরকাল নারীজাতিকে ... রেখেছিলেন, বলা যায় নারীদের পরিহার করে এসেছেন। অথচ সর্বের ... সমাজকে সংস্কার করতে হলে চাই নারী জাতির জাগরণ। 'না জাগিলে এই ...লনা এ ভারত বুঝি জাগে না জাগে না জাগে না।' নারী জাগরণ সম্পর্কে নানান ... আছে। কিন্তু আমরা নারী জাগরণ সম্পর্কে একটি স্থির সিদ্ধান্তে এসেছি ...টি শর্ত অবলম্বন করে।

সমাজে নারী ও পুরুষের সমান মর্যাদা, প্রতিষ্ঠা ও অধিকার।

নারী শিক্ষা।

নারীর সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করা।

৪) নারীকে মাতৃভাবে প্রতিষ্ঠিত করা।

৫) দেশীয় ঐতিহ্যে নারীকে প্রতিষ্ঠিত করা।

নারী-জাগরণ প্রসঙ্গে ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাক্। বৈদিক যু নারী সমাজ অতুচ্চ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল। জীবনের সব ক্ষেত্রে না পুরুষদের মতো সমান সুযোগ সুবিধা পেতেন। আর শিক্ষা ব্যবস্থা উচ্চমানের ছিল বা লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা, ঘোষার মতো বিদুষী নারীদের আমরা পেয়েছি। উপনিষদে যুগেও নারীদের আসন ছিল উঁচুতে। ব্রহ্মবাদিনি গার্গী, মৈত্রেয়ী সর্বজনবিদিত। এঁ মহীয়সী এবং সর্বশাস্ত্রে পারঙ্গমা। স্মৃতিশাস্ত্রে নারীর বিভিন্ন অধিকার স্বীকার ক হয়েছে। পরবর্তী যুগ ভারতের এক অন্ধকারময় যুগ। এ যুগে নারীরা হারাল তা মর্যাদা-বোধ ও সম্মান। এই অধঃপতনের যুগে মেয়েদের একমাত্র পরিচয় হল তা পুরুষের সেবাদাসী, ভোগ্যপণ্যা। ক্রমে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে মেয়েদের অব হল আরও ভয়ঙ্কর। শিক্ষা তো নেই, এমন কি স্বাধীনতার দ্বারও রুদ্ধ। এই শোচনী অবস্থার মধ্যে সমগ্র নারী-সমাজ হয়ে পড়ল বিধ্বস্ত, ক্লান্ত ও অবসন্ন। তাদের জীবনে আছে কোনও আলোর দিশা, না আছে আনন্দ, না আছে প্রশান্তি। অথচ সে তো চা আলো, চায় শিক্ষা। স্বামীজী মনে-প্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন আজ ভারতীয় নারী চতুর্দিকে শুধু তমসা, অজ্ঞানতা ও অজ্ঞতার কুঝটিকা।

আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠলো বৈদিক যুগের নারীদের উজ্জ্ব সুবর্ণচিত্র। মধ্যযুগ নারীদের অন্ধকারময় যুগ। অষ্ঠাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে নারীদে শোচনীয় অবস্থা দর্শনে স্বামীজী এগিয়ে এলেন। চাই নারী জাগরণ, চাই নারী শিক্ষা নারী মুক্তি।

শাস্ত্রকার মনুর উক্তি জ্বলজ্বল করে মনে ভেসে উঠলো। 'যত্র না পূজাস্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ'। অর্থাৎ নারী যেখানে সম্মান লাভ করে দেবতারা সেখানে বিরাজ করেন। যে দেশে নারীর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা সেই দেশকে স্বর্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

স্বামীজীর চিন্তা ও চেতনায় একটি মাত্র ব্রত হল নারী প্রগতি ও নারী জাগর প্রথমেই নারীকে পুরুষ শাসিত সমাজে সমান মর্যাদা ও অধিকার দিলে নারীর সম্ম প্রতিষ্ঠিত হবে। স্বামীজী বলছেন যে, "পুরুষ যদি ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে মেয়েরা পারবে কেন? নারী ও পুরুষের লিঙ্গভেদ ভুলে যেতে হবে, মনে রাখতে হবে সবই আত্মা নারীরা তো দুর্বল নয়, প্রয়োজনবোধে তারা লড়াই করতে পারে। অনেক সাহস বীরত্বের অধিকারী যে তারা, তার স্বাক্ষর মিলেছে ইতিহাসের পাতায়।

রামমোহন রায় ও সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ মনীষীরা নারী-পুরুষের [illegible] অধিকারের কথা বলেছেন। কিন্তু সমাজ ও সংসারে নারীর ভূমিকা খুবই [illegible] সংসারের সর্বময় কর্ত্রী নারী আবার সমাজের সর্বক্ষেত্রে পুরুষকে শক্তি ও [illegible] করে আসছেন। তাই স্বামীজী বারংবার নারীদের প্রশস্তি করে নারী [illegible] প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন।

নারী প্রগতি প্রসঙ্গে স্বামীজী প্রথম থেকেই নারী শিক্ষার কথা বলেছেন। [illegible] কথা স্মরণ করি ঃ প্রথমে তোমরা নারীদের শিক্ষায় অগ্রগতি সুচনা কর, [illegible] তারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করবে।' ভারতীয় নারীদের লক্ষ্য [illegible] বলছেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে জ্ঞানের আলো প্রজ্জ্বলিত কর, জ্ঞান থেকে [illegible] কর, ভয়শূন্য, দয়ার্দ্র, উদারমনা ও ব্যবহারিক দক্ষতাসম্পন্ন হও।' শিক্ষা [illegible] জ্ঞানের আলোক বিচ্ছুরিত হয়। ঐ যুগে বসে স্বামীজী চিন্তা করেছিলেন [illegible] ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা। মেয়েরা যদি শিক্ষিতা ও ঠিকমত মানুষ [illegible] তাদের সন্তান-সন্ততিরা দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। নারীদের দুর্ভাগ্যের [illegible] উদ্ধারের জন্য স্বামীজী শিক্ষাকেই একমাত্র মুক্তিপথ বলে নির্দেশ করলেন। [illegible] নারী শিক্ষাই নারী-জাগরণের একমাত্র প্রধান শর্ত।

নারীর সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তোলার জন্য স্বামীজী সকলকে আহ্বান [illegible]। স্বামীজীর অধ্যাত্মভাবনার সংমিশ্রণে নারীর সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে [illegible]। স্বামীজীর ছিল অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা নারীর শক্তি সম্বন্ধে। তাই তিনি [illegible] ঃ 'পাঁচশো পুরুষের সাহায্যে ভারতবর্ষকে জয় করতে পঞ্চাশ বছর লাগতে [illegible] কিন্তু পাঁচশো নারীর দ্বারা সে-কাজ করা যেতে পারে মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে।' [illegible] যথার্থই বলেছেন ঃ যেকোন সমাজের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক স্তরের [illegible] পরিচয় বহন করে তার নারী জাতির অবস্থা। মহাকালের যাত্রাপথে বহু [illegible] পতন ও সঙ্কটের মধ্যে সমাজ-জীবনে হীনতম অবস্থা সত্ত্বেও মেয়েরাই সর্বদেশে [illegible] ভারতে জ্বালিয়ে রেখেছিলেন ধর্মের অনির্বাণ দীপশিখা। প্রাত্যহিক [illegible] ছোটখাটো সচল কর্ম, পূজা, ব্রত, উপবাসের মধ্যে ধরে রেখেছিল ধর্ম ও [illegible], যা যে কোন জাতির প্রাণস্বরূপ।' স্বামীজী এই ধারণা সর্বদাই পোষণ করতেন [illegible] অতীত যুগের মহীয়সী নারীদের মহত্বকেও অতিক্রম করে যাবে আধুনিক যুগের [illegible]। নারীদের মধ্যে থাকবে ত্যাগ, তিতিক্ষা, ধৈর্য, পবিত্রতা, উদারতা, [illegible] প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলি। আধ্যাত্মিকতার অগাধ ঐশ্বর্যের অধিকারিণী [illegible] মধ্যে এই সব সদ্‌গুণগুলি আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল। মা সারদা [illegible] দিয়েছেন যে কিভাবে নিজের জীবনকে মহনীয় করে তোলা যায়।

নারী জাগরণ প্রসঙ্গে বা নারী-প্রগতির পক্ষে নারীর পূর্ণতা যে মাতৃত্ব তা অবশ্যই স্বীকার্য। স্বামীজীর মতে, নারীর আদর্শ হল তার মাতৃত্বে - যা স্বার্থলেশ শূন্য, কষ্টসহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল। তাঁর মতে ঃ 'ভারতীয় জননীই আদর্শ নারী। মাতৃভাবই এর প্রথম ও শেষ কথা'। মাতৃত্ব নারীত্বকে পূর্ণ করে। মায়ের ভালবাসায় কোনও জোয়ার-ভাঁটা নেই, কেনা-বেচা নেই, জরা-মৃত্যু নেই। নারীকে কেন্দ্র করে যখন সমাজ-সংসার গড়ে ওঠে তখন তাকে আদর্শ মা হতেই হবে। আদর্শ মা ছাড়া আদর্শ সন্তান সম্ভব নয়। এই আদর্শ সন্তানই একদিন হয়ে ওঠে আদর্শ নাগরিক। আর এইজন্যই স্বামীজী বারবার সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীর আদর্শ তুলে ধরেছেন নারীজাতির চোখের সামনে। 'মনে রাখিও তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী'। আদর্শ জননী প্রসঙ্গেও সেই শিক্ষার কথাই এসে যায়। হৃদয়ের অন্তঃস্থিত পূর্ণতাকে পরিস্ফুট করে তোলাই তো নারী-শিক্ষার শেষকথা। স্বামীজী এক্ষেত্রে সেই Man Making Mission এর কথা বলেছেন। আগে মানুষ - তারপর নারী। তারপর জননীতে তার আত্মপ্রকাশ। যে ইউরোপীয় শিক্ষা বর্তমানে প্রচলিত আছে তা স্বামীজী কখনই সমর্থন করেননি। নারীদের সমস্যা সমাধানে পুরুষেরা তাদের মতামত ও চিন্তাধারা নারীদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। স্বামীজীর মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় ঃ ' নারীরা নিজেদের সমস্যা নিয়ে নিজেরা চিন্তা করুক, নিজেরাই সমাধান খুঁজে বের করুক। ত্যাগী, শিক্ষিতা নারীরাই ভার নিক নারী-শিক্ষার, তারা পুরুষের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেদের সমস্যার সমাধান নিজেরাই করুক। বৈদান্তিক তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে কি নারী কি পুরুষ যখন যথার্থ আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে তখন স্থান কাল পাত্র অনুসারে যে কোন সমস্যাই আসুক না কেন, তারা তা নিজেদের স্বাধীন বিচারবুদ্ধি দিয়ে মোকাবিলা করতে পারবে। এইভাবে স্বামীজী নারী প্রগতির এক নতুন দিগন্ত খুলে দিলেন। স্বামীজীর ভাষায় - 'আমি পুরুষগণকে যাহা বলিয়া থাকি, নারীগণকে ঠিক তাহাই বলিব। ভারত এবং ভারতীয় ধর্মে বিশ্বাস কর, তেজস্বিনী হও, আশায় বুক বাঁধো, ভারতে জন্ম বলিয়া লজ্জিত না হইয়া উহাতে গৌরব অনুভব কর।'

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের যে যুগে আর্বিভাব, সেই যুগে নারী ছিল অবহেলিতা ও উপেক্ষিতা আর সর্বক্ষেত্রে অনাদৃতাও বটে। সমাজে, সংসারে ও পরিবারে কোথাও তাদের কোনরকম সম্মান, মর্যাদা বা স্বাধীনতা ছিল না। নারীর মূল্য নির্ণীত হত বংশ রক্ষায় এবং পুরুষের কামনা পরিতৃপ্তিতে। স্বাধীনতার জগৎ থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্না অসূর্য্যম্পশ্যা, অন্তঃপুরবাসিনী নারীতে পরিণত হয়েছিল। এই অবস্থা থেকে নারীকে জাগিয়ে তোলার জন্য এবং তাদের প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা দান করার জন্য স্বামীজীই প্রথম এগিয়ে এলেন। 'আমাদের দেশ আজ সকলের অধম কেন।

এতে নারীর অবমাননা হয় বলে।' তাইতো স্বামীজী নারীকে সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত করে নারী-প্রগতির পথকে প্রশস্ত করতে প্রয়াসী হলেন।

এই ইচ্ছা /চিন্তা আজ অনেকখানি বাস্তবরূপ লাভ করেছে। আজ নারী প্রগতি সম্বন্ধে সকলেই নিঃসন্দিগ্ধ। নারী জীবনের যে অন্ধকার দিকগুলি নারীকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল তা আজ অন্তর্হিত। নারী আজ শুধু অন্তঃপুরের বন্দীশালায় বন্দী নয়, তারা সর্বত্রই নারীরূপেও শুধু পরিচিতা নয়। আজকের নারী ঘরে-বাইরে তাদের কর্মের পরিধি ছড়িয়ে দিয়েছে। সর্বত্র দেখা যাচ্ছে মেয়েদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে আজকের নারী পুরুষের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চলেছে। ঘরোয়া নয়, শিক্ষা, ব্যবসা-বানিজ্যে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, চিকিৎসা, রাজনীতি-অর্থনীতিতে, প্রশাসনে, কাব্যে-নাটকে, শিল্পে সর্বত্র সমান পরিশ্রমে এবং সমান বেতনে পুরুষদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে চলেছে। এতে দেশের ও জাতির মর্যাদা বেড়েছে। আর নারীরাও বিভিন্নভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে। আজ নারী শিক্ষিতা, স্বনির্ভর, অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন ও মনের জানালা খোলা পূর্ণ মানুষ। কিন্তু এও সত্য যে কিছু নারীর, স্বাধীনতার নামে ঔদ্ধত্য, বিদেশী অনুকরণপ্রিয়তা যেন সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে। মনুষ্যত্বের সীমা থেকে যাতে আমরা সরে না যাই সে বিষয়ে আমাদের নারীদের সচেতন হতে হবে। নারীরা আজ আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হল ঠিকই কিন্তু পবিত্রতা এবং মানবতার ধার ধারল না, তাহলে কি নারী-জাগরণ এবং নারী-প্রগতি, সার্থক হল? নারী-প্রগতি মানে নারীজনোচিত গুণগুলিকে বিসর্জন দিয়ে পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়। 'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দেবে অধিকার?' - নারী কণ্ঠে এই তূর্য-নিনাদ আমাদের সচকিত করে।

তবু বলি নারীর এত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নারী কিন্তু তাদের সেই বাঞ্ছিত স্বাধীনতার স্বাদ এখনও আজ পর্যন্ত পায়নি। তাদের অপরের মুখ চেয়ে এখনও জীবন কাটিয়ে দিতে হয়। কি দুর্ভাগ্য আমাদের দেশের নারীদের। এই জন্যই ভারতের নারী জাগরণের মূল স্রোতটি বইয়ে দেওয়ার জন্য স্বামীজী আনলেন তাঁর পাশ্চাত্য বিজয়ের শ্রেষ্ঠ ফসল মিস্ মার্গারেট নোবেলকে। ভারতের নারীদের নিদ্রিত অহল্যা শক্তিকে জাগ্রত করতে এবং তাদের শিক্ষা ও উন্নতিকল্পে মার্গারেটকে তিনি নিবেদিতায় রূপান্তরিত করলেন। আর আমেরিকা থেকে স্বামীজী লিখছেন গৌরী-মা সম্বন্ধে - Where is Gouri Ma? That noble and stirring spirit !' শত শত জ্যান্ত জগদম্বার সৃষ্টি করবে। আর এই নারীরাই হবে বীর প্রসবিনী ও সমাজ কল্যাণে নিবেদিতা এবং এরাই তো জগৎ তোলপাড় করবে।

স্বামীজী আদর্শ নারীর সন্ধান পেয়েছিলেন শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর মধ্যে। তিনি

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নারীর গুণাবলীর সমন্বয়ী মূর্তি। তাইতো প্রশ্ন জেগেছিল তিনি কি 'পুরাতন যুগের শেষ প্রতিনিধি না নতুন জীবনের অগ্রদূত?' তিনি দুটিই। তাই স্বামীজী বলেছেন- 'শ্রীশ্রীমা-কে কেন্দ্র করেই ভারতীয় নারী-জাগরণের উদ্বোধন ঘটবে। শ্রীশ্রীমা একদিকে সীতা-অরুন্ধতীর মতো পতিপ্রাণা, অন্যদিকে দ্রৌপদী ও সাবিত্রীর মতো তেজস্বিনী, আবার গার্গী, মৈত্রেয়ীর মতো ব্রহ্মবাদিনী। প্রচণ্ড জ্যোতি, সে জ্যোতিতে দাহের জ্বালা নেই, আছে অসীম শান্তি ও তেজের বিকাশ- সেই জ্যোতিতে জ্যোতিস্মান হওয়াতেই নারী-জাগরণের যথার্থ বিকাশ। আর শ্রীশ্রীমা এই আদর্শটি স্বীয় জীবনে দেখিয়ে গেছেন।'

সবশেষে বলি, আজকের নারীর সামনে শিক্ষার সবরকম দ্বার উন্মুক্ত। তারা সবরকম স্বাধীনতা পেয়েছে কিন্তু সত্যি সত্যি কি নারী জাগরণ পৃথিবীর সর্বত্র ঘটেছে? তাই এখনও নারীরা পথ খুঁজে চলেছে। সেই পথের সন্ধান সম্ভবতঃ দিতে পারেন শুধু তাঁরাই যাঁরা শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করে স্বামীজীর আদর্শে নিজেদের জীবন গড়েছেন।

সহায়কগ্রন্থঃ

১) স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা ৬ষ্ঠ ও নবম খণ্ড।
২) স্বামী গম্ভীরানন্দ - যুগনায়ক বিবেকানন্দ।
৩) বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ - শঙ্করীপ্রসাদ বসু।
৪) বিবেকানন্দ চরিত - সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।
৫) চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ - স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত।
৬) আমার ভারত অমর ভারত - স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত।
৭) উদ্বোধন পত্রিকা।
৮) সবার স্বামীজী - স্বামী লোকেশ্বরানন্দ।

(লেখিকা লেডি ব্র্যাবোর্ণ কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপিকা ও সহযোগী নির্দেশিকা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব্ কালচার, গোলপার্ক)

"সর্বধর্মের প্রসূতি-স্বরূপ যে সনাতন হিন্দুধর্ম ..... যে ধর্ম জগৎকে চিরকাল সমদর্শন ও সর্ববিধ মত গ্রহণের বিষয় শিক্ষা দিয়া আসিতেছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি।"

-স্বামী বিবেকানন্দ
চিকাগো বক্তৃতা ১১.০৯.১৮৯৩

Swami Vivekananda's View on Education

Dr. Aditi Bhattacharya
Department of Philosophy
Uluberia College

Swami Vivekananda's view on education is unique and revolutionary which still has its relevance for our present system of education. Born in the late nineteenth century at a critical juncture of Indian history, Swamiji was well aware of the socio-cultural scenario of the country where the age-old traditional values are being constantly distorted by the so-called intelligentia as a result of the direct influence of the West. Swamiji wanted to build up an educational system which should have its root in Indian culture but at the same time must embrace what is true and best in western thought. He wanted to reconcile the spiritual heritage of the East with the scientific spirit of the West. He witnessed in the West the great efforts to impart education in all spheres of life and he wanted to do the same in India. He regretted "modern education system in India is nothing but a perfect machine for turning out clarks"[1]. The irony is that this observation of Swamiji which was true in British ruled India is still true today even after sixty five years of our independence.

Swamiji viewed education as the manifestation of inherent perfection in man. Education is not a means of collecting information, it is the awakening of the life-force which controls us. We have forgotten the truth that education does not mean cramming a lot of subjects into the students and ruining their brains. This reminds us Tagore's famous short story "Tota Kahini" where in the name of giving education to a parrot (which is symbolic) the royal princes forced it to eat the pages of scripture (which is again symbolic) and thus quickened its death. The educationists of our country have failed to build up an educational system which would teach our students think for themselves, rather it has taught them to collect unnecessary information instead of delving into the depth of the subjects they learn. Hence it does not help them to

manifest their inherent perfection - it forces them to remain updated with unnecessary and superfluous tit bits.

Swamiji used to think proper education should instil 'Sradha' in us - it should teach us to be aware of the greatness of our own heritage. With great regret Swamiji pointed out : "We master all the facts and figures concerning ancestors of the English, but we are sadly unmindful of our own. "[2] He thought one must be proud of one's national history because "..... a national history keeps a nation well-restrained and does not allow it to sink so low"[3]. Looking at the negligence and disrespect for our great heritage among the young generation we now feel the truth of Swamiji's thought. He reminded us that a total break with the past means moral, cultural and spiritual suicide.

Swamiji was well aware of the scientific and technological advancement of the West and he felt that India needs this scientific and technological knowledge. But he realised that this sort of knowledge is not sufficient - harmonious blending of the scientific knowledge of the West with the religious and spiritual heritage of the East can serve humanity properly. When we see in our obsession with scientific and technological advancement how we have forgotton the truth that science is for man - not man for science, we can realise the foresightedness of his vision. Swamiji did not however underestimate the importance of science and technology. He felt the necessity of technical education for a poor country like ours. " It would be better if the people got a technical education, so that they might find work and earn their bread, instead of dwadling about and crying for service."[4] He learnt this lesson from the West where only those persons who have a real aptitude for learning are allowed to go for higher studies; but the general mass of the students after their completion of the studies at school level are encouraged to take technical training so that they can be self dependent and earn their living. With our great dismay we find that our educationists have failed to see this truth and in their hue and cry for mass education they have turned our education system

into a sheer farce.

Swamiji felt the need of mass education in our country. He confessed that by seeing the educational opportunities for the poor mass in the West he used to remember the plight of the poors in India and could not help shedding his tears. He pointed out that the lack of proper education is the main cause of the intolerable suffering of our countrymen. Only true education can inculcate self-respect in them and can rescue them from being exploited by a few clever and so-called educated people of the society. Not only that, from time immemorial they have been taught to believe in meaningless superstitions and superfluous religious activities so that they can be oblivion of their helpless plight and accept it as their fate without raising any protest. When Swamiji spoke of mass education he did not mean to teach them only three r's but to teach them self-respect and humility, straightforwardness and courage so that they can speak for themselves. Swamiji had told us that the backwardness of our country is mainly due to our negligence of mass. He said that as long as the crores of our countrymen will remain in the darkness and starvation our country will not progress and it is our social responsibility to give them proper education, food and shelter. "So long as the millions live in hunger and ignorance, I hold every man a traitor who, having been educated at their expense, pays not the least heed to them!"[5] announced he in his stentorian voice. This is still true for our country. We must not forgot that millions, who live in hunger and ignorance have their contribution in our education, however, slight their contribution is. We must try to do something for them so that they can live as a human being.

Swamiji taught us ignorance is the main obstacle against all sorts of progress, we have to fight with it, we have to conquer it with true knowledge which can come through proper education. " The doors are open for us, and yet we struggle. The struggle we create through our own ignorance, through impatience; we are in too great a hurry."[6] The ugly competition and rat race which is the characteristic feature of the present

scenario of our education system is thus, according to Swamiji, nothing but the reflection of our ignorance. Proper education teaches us that education is not someone's private property. We, in our ignorance, try to achieve something by denying the justified claim of others. We are becoming selfish and self-centered and forget to share with others. As a result we are now living in an ego-centric world.

Swamiji was concerned not only with the education of the poor men of our country but also with the education of women. He firmly believed that women of India should be properly educated and education is the only thing which can free them from their suffering. He told "I do not understand why there is so much discrimination between man and women in our country"[7] - he claimed equal dignity for man and woman. Coming in contact with the educated and enlightened women of the West he felt for the neglected women of his country and lamented over their conditions. With great concern he announced "the country or family where women spend their lives in suffering, there is no hope for progress for that family or country."[8] In today's India the women are getting opportunities for education, yet still now there is a much discrimination between men and women in our country and when we find that women are being constantly heckled in their families, in their workplaces, in roads and in everywhere, the truth of Swamiji's observation becomes evident. Swamiji wanted to impart education to the women based on religion. A modern man may be a bit apprehensive and critical to this idea of Swamiji. He may wonder whether by insisting on women's education based on religion Swamiji introduced a discrimination between men and women. Moreover, in this age of science and technology what is the necessity of religion - is it not taking refuge in blind faith and superstition? Here we should remember that by religion, Swamiji did not mean any sort of sectarion religion which demands unquestionable faith and surrender to religious creed and dogma, but great religious ideas which help to develop human values in us. He felt that religion should be the central focus of all sorts of education. But in speaking of

women education he especially insisted on religion only because of the fact that women are the real sustainer of the society - the child first learns the basic human values from its mother. Hence value education is most necessary for women.

In his discussion on education Swamiji specifically pointed out the role of a real teacher. ".....within man is all knowledge - even in a boy it is so - and it requires only an awakening, and that much is the work of a teacher."[9] So to educate means to remove away the obstacles, to awaken the potentiality hidden in the student. This view of Swamiji reminds us the great Greek philosopher sage Socrates who believed that the task of a teacher is the task of a mid-wife. The mid-wife helps the pregnant mother to give birth to her child, similarly the teacher helps the students to give birth to their thoughts hidden in their minds. Like Swamji, Socrates also held that teacher cannot teach, he can only ignite the flame of knowledge inherent in the student. In today's education system of India where spoon feeding is the regular and most wanted practice, this view of Swamiji or Socrates seems to be a far cry. Swamiji used to think that a teacher must be honest, straightforward, candid and tolerent. He must have a loving heart and should be the real friend philosopher and guide to his students. In this respect he spoke about the 'Gurukul' system of ancient India where the students used to live in 'Gurugriha' and learnt from the guru not only 'Sastras' but the lessons of life and where the guru was their ideal, their guide. According to Swamiji that person is a real teacher who can easily come down to the level of his students and can identify himself with them in their happiness and sorrow. Such a person alone is capable of imparting education to his students. This picture of an ideal teacher, as painted by Swamiji, compels us, especially those of us who are proud of our role as a teacher, to stand face to face with ourselves and ask the question - "Are we really living up to that role?"

Another important aspect of Vivekananda's view of education is his vision of 'whole man'. To him education means

an integral education which helps the development of a 'whole man'. He believed in a harmonious balance of body, mind and spirit and for this sort of balance an integral education is necessary. Modern education system gives emphasis only on the development of mind and intellect and neglects the physical and spiritual aspect. Swamiji believed that a physically weak person cannot excel in life however strong his mind is. On the other hand, spiritual development lays the foundation on which the whole edifice of man's life stands. Education must aim at the development of spiritual values in a person which helps to manifest the perfection and divinity inherent in him. Swamiji pointed out that each man is potentially divine and an integral education system helps him to actually be what he potentially is. A man without spiritual values is not a perfect man however successful his intellectual life is. This idea of Swamiji is not a new idea - in ancient education system of India emphasis was given on the all round development of a person. The stalwarts of our country like Rabindra Nath Tagore and Sri Aurobindo also had given emphasis on integral education that helps to develop man physically, mentally and spiritually. We are witnessing the tragedy of overemphasing on intellectual development in our day-to-day life. If our educationists are a bit sensitive regarding this particuilar issue, our country can produce men who are not self-centered, demoralised and materialistic. To make a better India we need such men.

From the above discussion, it is clear that Vivekananda's thought on education is not only expansive touching every aspect of man's life, but also very deeprooted. His emphasis on mass education, women's education importance of scientific and technological education as well as cultural and value education, and his concern for an all-round development of man is something which should be cherished and admired for ever.

Reference :

1. Complete works of Swami Vivekananda, vol-v, page 369.
2. Ibid, page 332.
3. Ibid, page 365
4. Ibid, page 367
5. Ibid, page 58
6. Ibid, page 279
7. Amritalok Patrika, Swami Vivekananda : Sardhasatabarsha Samikshya
8. Ibid.
9. Complete works of Swami Vivekananda, vol-v, page 366
10. Swami Vivekanenda's contributions to education. An Essay Written by J. Lahiri, published in Vivekananda Commemoration Volume, 1965, University of Burdwan.

আমন্ত্রিত রচনা

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ভারতীয় নারী

ডঃ চিত্রিতা দত্ত
অধ্যাপিকা, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজ
নিউ ব্যারাকপুর

এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান যেমন সম্ভব নয়, তেমনি নারী এবং পুরুষ উভয়েরই জীবন যদি সমানভাবে উন্নত না হয়, শিক্ষিত, আলোকপ্রাপ্ত, সচেতন, কুসংস্কারমুক্ত, প্রগতিশীল না হয়, তবে দেশের বা জগতের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব নয় - এই ছিল আধুনিক ভারত গঠনের অন্যতম বিশিষ্ট মানুষদেরই একজনের মত। যিনি আবির্ভূত হবার দেড়শ বছর কেটে গেল, তবু আজও মানুষ তাঁর চিন্তা-চেতনা-বাণীতে সমানভাবে উদ্দীপিত, তিনি স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বামীজি মেয়েদেরকে নিয়ে যখন এইভাবে ভেবেছেন, তখন কিন্তু ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাংলার ঘরে ঘরে মেয়েরা অত্যন্ত উপেক্ষিত, অত্যাচারিত, সম্ভ্রমহীন অবস্থায় কোনক্রমে দিন কাটাচ্ছে। তাদের দুঃখ-যন্ত্রণার কথা শুনবার জন্য, তার প্রতিবিধানের জন্য ঘরে-বাইরে কোন মানুষ নেই। কোনক্রমে জীবনের প্রথম কয়েকটা বছর কাটিয়ে দিতে পারলেই, সামাজিক সম্মান হারাবার ভয়ে পরিবারের কাজ ছিল কোন ক্রমে তাকে পরগোত্র করে দেওয়া, সে ঘর-বর যেমনই হোক। আর স্বামীর বাড়ি ছিল, পরবর্তী জীবনের যাবতীয় লাঞ্ছনা ভোগের অন্ধকূপ, যেখানে স্বামীর মনোরঞ্জন, সন্তানের জন্মদান আর সংসারের যাঁতাকলে পিষ্ট হতে হতে তিলে তিলে শেষ হয়ে যাওয়াই ছিল মেয়েদের অদৃষ্ট। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে বিবেকানন্দ বললেন যে নারীজাতি এবং জনসাধারণের প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞানলাভের উপরেই নির্ভর করছে ভারতের উন্নতি এবং সবরকমের সমস্যার সমাধান। লক্ষ্য করবার বিষয় তিনি শুধু মেয়েদের শিক্ষালাভের কথাই বললেন না, মেয়েরাও যে সমস্ত জনসাধারণেরই অঙ্গ এবং অংশ, তাদের উন্নতি না হলে, কোন জাতির উন্নতি সম্ভব না, সে কথাও বললেন। মেয়েদের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি জনসাধারণের শিক্ষার কথাও বললেন। মানুষকে বুঝিয়ে দিলেন, মেয়েরা শুধু মেয়েই নয়, প্রথমে তারা মানুষ এবং আর পাঁচটা পুরুষ মানুষের মত সমাজ-সংসারের কাছ থেকে তাদের একই শিক্ষা-সুবিধা-সুযোগ-স্বীকৃতি পাবার কথা, তারপর তারা মেয়ে এবং তাঁদের নারীসুলভ গুণ-যোগ্যতার বিচার।

এই পুরুষ-শাসিত ব্যবস্থায়, সমাজ-সংসারের অধিকাংশ পুরুষই শুধু মেয়েদের

অন্ধকার-জীবনে বেঁধে রেখেছিল, তা নয়, মেয়েরাও নিজেদের স্বাধীনতা - স্বাতন্ত্র্য - সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য কোন প্রতিবাদ বা পদক্ষেপ নিতে পারে নি। এর মূলে ছিল প্রধানত অশিক্ষার অন্ধকার। এই জায়গা থেকেই বিবেকানন্দ বার বার মেয়েদের শিক্ষা ও জ্ঞানলাভের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

নারী শিক্ষার কথা যে শুধুমাত্র বিবেকানন্দই বলেছেন তা নয়, নারী মুক্তি, নারী শিক্ষার সঙ্গে রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত মনিষীদের নাম যুক্ত। কিন্তু বিবেকানন্দ মনে হয় সেইখানেই ব্যতিক্রমী যে তিনি শুধু নারী মুক্তি, নারী কল্যাণের জন্যই মেয়েদের শিক্ষার কথা বলেন নি, মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনটা গোটা জাতির শিক্ষার প্রয়োজনের সঙ্গে এক করে দেখে পরিবার-সমাজ ও জাতীয় জীবনে তাদের মূল্য এবং গুরুত্বটা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

ভারতে যখন প্রথম সভ্যতার আলো দেখা দেয়, সেই বৈদিকযুগে নারী ও পুরুষের ছিল সমান অধিকার। স্বামী এবং স্ত্রী একসঙ্গে যজ্ঞ সম্পাদন করতেন। সমাজে নারী - পুরুষের সম্মান ও মর্যাদার মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। উপনিষদের যুগেও মেয়েদের এই মর্যাদা অক্ষুণ্ণ ছিল। গার্গী, মৈত্রেয়ীরা এইভাবেই ভারতের ইতিহাসে অম্লান হয়ে আছেন। তারপর স্মৃতি-পুরাণের যুগ থেকে মেয়েদের অবস্থার অবনতি হতে থাকে। ধীরে ধীরে মেয়েদের মর্যাদার হানি ঘটতে ঘটতে, মেয়েরা হয়ে দাঁড়াল পুরুষের ভোগ্যপণ্য। মেয়েদের জন্য রুদ্ধ হয়ে গেল শিক্ষা-স্বাধীনতার দ্বার, যদিও শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই নয়, গোটা বিশ্বেই মেয়েদের অবস্থা ছিল কম বেশি অধঃপতিত। আমাদের দেশে জনসাধারণ ও মেয়েদের অবস্থা কতটা খারাপ হয়েছিল সে কথা বলতে গিয়ে স্বামীজি তাঁর একটি পত্রে লিখেছিলেন, '.... শত শত যুগব্যাপী মানসিক, নৈতিক বা দৈহিক অত্যাচারের কথা যাহাতে ভগবানের প্রতিমাস্বরূপ মানুষকে ভারবাহী গর্দভে এবং ভগবতীর প্রতিমাস্বরূপা নারীকে সন্তানধারণ করিবার দাসীস্বরূপা করিয়া ফেলিয়াছে এবং জীবন বিষময় করিয়া তুলিয়াছে ....।' অন্য একটি পত্রে লিখেছিলেন, 'আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহা অপবিত্র বলি। তারফল - আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র।' আরও লিখেছিলেন 'তোমাদের মেয়েদের উন্নতি করিতে পারো? তবে আশা আছে। নতুবা পশুজন্ম ঘুচিবে না।' নারীমুক্তি, নারী প্রগতির বিষয়ে স্বামীজির দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সম্পূর্ণ মৌলিক। তিনি নারী-মুক্তি, নারী প্রগতি আন্দোলনের পরিবর্তে স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি যেমন ব্যবহারিক জগতে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন ভেদ করেন নি, তেমনি আধ্যাত্মিক জগতেও তিনি নারী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করতে চান নি। তিনি বিশ্বাস করতেন সবরকমের সমস্যার সমাধান সম্ভব শিক্ষার মাধ্যমে আর তার ভিত্তি হবে আধ্যাত্মিকতা। তিনি বলেছিলেন, '.... আমি

পুরুষগণকে যাহা বলিয়া থাকি, নারীগণকে ঠিক তাহাই বলিব। ভারত এবং ভারতীয় ধর্মে বিশ্বাস কর, তেজস্বিনী হও, আশায় বুক বাঁধো, ভারতে জন্ম বলিয়া লজ্জিত না হইয়া উহাতে গৌরব অনুভব কর .... ।'

উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন মনিষীরাই প্রধানত নারীমুক্তির বার্তা বহন করে আনেন। পরাধীন ভারতবর্ষে এক ধরণের প্রতিকূলতার মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষার পত্তন হওয়ায় এবং নেতৃবৃন্দ মূলত পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ায়, ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং আধ্যাত্মিকতার প্রভাব তাতে বিশেষ ছিল না। স্বামীজি স্ত্রী শিক্ষার সেই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন, 'দেশে নতুন আইডিয়া প্রথম প্রচারকালে কতকগুলি লোক ঐভাবে ঠিক গ্রহণ করতে না পেরে অমন খারাপ হয়ে যায়। তাতে বিরাট সমাজের কি আসে যায়?' সেই সঙ্গে মন্তব্য করেন, 'ধর্মকে Centre করে রেখে, স্ত্রী শিক্ষার প্রচার করতে হবে। ধর্ম ভিন্ন অন্য শিক্ষাটা Secondary হবে। ধর্ম শিক্ষা, চরিত্র গঠন .... নতুবা তার কাজে গলদ বেরোবেই।' মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বললেন, 'তোমাদের নারীগণকে শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও। তারপর তাহারাই বলিবে, কোন জাতীয় সংস্কার তাহাদের পক্ষে আবশ্যক।'

আধুনিক যুগে স্কুল-কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়ের সংখ্যা বেড়েছে। সুদূর গ্রামাঞ্চলেও শিক্ষার সুযোগ বাড়ছে। তারপরেও কিন্তু দাম্পত্যজীবনে ভাঙন আসছে, ভেঙে গেছে যৌথ পরিবার, বিনষ্ট হচ্ছে সমাজ-জীবনের শৃঙ্খলা। অর্থাৎ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও, সেই শিক্ষায় কোন রকম একটা ফাঁক থেকে গেছে। এই প্রসঙ্গে স্বামীজির একটি উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে - 'সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছদে লজ্জাহীনা বিদুষী নারীকুল, নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গী, অপূর্ব বাসনার উদয় করিতেছে; আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া ব্রত-উপবাস, সীতা-সাবিত্রী, তপোবন জটাবল্কল, কাষায়-কৌপীন, সমাধি আত্মানুসন্ধান উপস্থিত হইতেছে।'

পুরুষ এবং নারীর শারীরিক ও মানসিক গঠন বিভিন্ন। সুতরাং তাদের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকবেই। সমাজের সার্বিক উন্নতির জন্য পুরুষ ও নারীর বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা ও কাজের প্রয়োজন আছে। এর দ্বারা এ'কথা প্রতিপন্ন হয় না যে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, নারী হীন। বরং পুরুষের সঙ্গে অকারণ এবং অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতাই নারীকে হীন করে। আবার পুরুষের পক্ষে নারীর অনুকরণ করার চেষ্টা সমীচীন নয়। স্বামীজি বিশ্বাস করতেন মেয়েরা শুধুমাত্র অন্তঃপুরে আটকে থাকবে না, বাইরের পৃথিবীতেও বহুদূর পর্যন্ত তাঁর কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হবে। প্রকৃতপক্ষে নারীকে স্বমহিমায় নিজ ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। নারী শক্তির প্রতীক। মেয়েরা নিজেদের শক্তি সম্পর্কে সচেতন হলে, তার মৌলিক

অবদান যদি সমাজ-সংসারে রাখতে পারে, তখনই তার প্রকৃত শক্তিময়ী রূপটি উদ্ভাসিত হবে এবং নারী কি ঘরে, কি বাইরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা যেখানে সর্বাধিক সফল, সেই বস্তুতন্ত্রবাদী আমেরিকার সভ্যতা ও সংস্কৃতির রূপ ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা স্বামীজির দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথম পরিচয় তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল, কিন্তু তাদের সম্পদ ও ক্ষমতার লিপ্সা, শীঘ্রই তাঁর ভুল ভেঙে দেয়। এই ভ্রান্ত জীবনবোধের পরিবর্তনের জন্য তিনি বলেছিলেন, 'মানুষের কাছে তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বাণী প্রচার করতে হবে এবং সর্বকার্যে সেই দেবত্ববিকাশের পন্থা নির্ধারণ করে দিতে হবে।.... জগতের ধর্মগুলি এখন প্রাণহীন মিথ্যা অভিনয়ে পর্যবসিত। জগতের এখন একান্ত প্রয়োজন হল চরিত্র। জগৎ এখন তাঁদের চায়, যাঁদের জীবন প্রেমদীপ্ত এবং স্বার্থশূন্য। নারীর সমস্যা দৈনন্দিন জীবনে যদি বা কিছু পৃথকও হয়ে থাকে, নরনারী নির্বিশেষে, সকলেরই জীবনের উদ্দেশ্য সেই চরম সত্য লাভ করা। বিবেকানন্দ নিজেকে সমাজ-সংস্কারক বলতে দ্বিধা করেন নি। কিন্তু তাঁর সমাজসংস্কারের প্রয়াসটা ঠিক প্রচলিত ধারার সঙ্গে এক ছিল না।

স্বামীবিবেকানন্দ নিজে ভয়ংকর জাতিভেদপ্রথা ও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করলেও, তিনি আবার একথাও মনে করতেন না যে ঐ দুই প্রথার রহিত হলেই জনগণ ও নারীজাতির উন্নতি আপনা থেকেই হয়ে যাবে। বাল্যবিবাহ রোধ এবং বিধবাবিবাহের প্রবর্তন তাঁর কাছে খুব বড় বদল বা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হিসেবে দেখা দেয় নি। কারণ তিনি জানতেন, বিধবার আরেকবার বিয়ে হলেই একটি জাতির ভাগ্যে বিরাট পরিবর্তন আসে না। তিনি স্পষ্টই লিখেছিলেন, 'জাতিভেদ থাকা উচিত কিনা, স্ত্রীলোকেদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া উচিত কি না, এ' বিষয়ে আমার মাথা ঘামাইবার দরকার নাই।'

অত্যন্ত জোরের সঙ্গে তিনি বলেছিলেন '.... নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জন করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেদের জোরে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে। তাহাদের লইয়া অপর কেহ এ কার্য করিতে পারে না, করিবার চেষ্টা করাও উচিত নহে। আর জগতের অন্যান্য দেশের মেয়েদের মতো আমাদের মেয়েরাও এ' যোগ্যতালাভে সমর্থ।'

আমাদের দেশের মেয়েরা যখন এ'ভাবে গৃহপ্রাচীরের অন্তরালে বন্দিনী তখন বিদেশের শত শত শিক্ষিতা উদারহৃদয়, মহীয়সী মহিলার সঙ্গে এদেশের অবস্থা তুলনা করে বিবেকানন্দ অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে বলেছিলেন, 'আমাদের মেয়েরা বরাবরই প্যানপ্যানে ভাবই শিক্ষা করে আসছে। একটা কিছু হলে কেবল কাঁদতেই মজবুত।' আবার সেই সময়েই তিনি এ'কথাও বলেছিলেন, 'একমাত্র ভারতবর্ষেই মেয়েদের

লজ্জা, বিনয় প্রভৃতি দেখে চক্ষু জুড়ায়। এমন সব আধার পেয়েও তোরা এদের উন্নতি করতে পারলিনি। এদের ভেতর জ্ঞানালোক দিতে চেষ্টা করলিনে? 'এদেশে পুরুষে-মেয়েতে এতটা তফাৎ কেন যে করেছে, তা' বোঝা কঠিন। বেদান্ত শাস্ত্রেতো বলেছে একই চিৎসত্তা সর্বভূতে বিরাজ করছেন। তোরা মেয়েদের নিন্দাই করিস, কিন্তু তাদের উন্নতির জন্য কি করেছিস বল্ দেখি ?' স্বামীজি শিক্ষার অসাধারণ শক্তির ওপর ভরসা করতেন এবং এ'কথাও বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষা নানারকম সমস্যা সমাধানে সক্ষম, তবে তা শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয়। তিনি এমন শিক্ষার কথা বলতে চেয়েছিলেন যার মাধ্যমে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে, চরিত্র সংগঠিত হবে। নিজে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে ও আত্মজ্ঞানের অধিকারী হবে। স্বামীজি শুধু মেয়েদের আলাদা করে দেখেন নি বা পুরুষেরা সমাজ সংসারে সব দিক থেকে এগিয়ে আছে এ'কথাও মনে করেন নি। তিনি বিশ্বাস করতেন লেখাপড়া শিখে কর্মক্ষম হওয়া পুরুষ ও নারীর জন্য অবশ্যই প্রয়োজন। সেটাকেই বিবেকানন্দ জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে মনে করতেন না। তিনি মনে করতেন পুরুষ এবং নারী উভয়ের জীবনের লক্ষ্য সব রকমের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ। অর্থাৎ মেয়েরাই শুধু বন্ধনের মধ্যে ছিল, এ'কথাও তিনি মনে করতেন না। কারণ মেয়েরা সমগ্র জনগোষ্ঠীর অংশ। সুতরাং তাদের বন্ধন মুক্তির কথা বলতে গেলে, মানবজাতির বন্ধন মুক্তির কথাই বলতে হয়, মেয়েদের পেছনে পড়ে থাকা, পিছিয়ে থাকা কম শিক্ষা-শক্তির প্রতিনিধি মনে করে নয়। সোজা কথায় ব্যবহারিক জীবনেই হোক বা আধ্যাত্মিকে জীবনেই হোক বিবেকানন্দ পুরুষ এবং নারীর মধ্যে কোন ভেদাভেদ করতে রাজি হন নি। তিনি বলতেন, আত্মাতে কি লিঙ্গভেদ আছে নাকি? দূর কর মেয়ে আর মদ্দ, সব আত্মা।'' আমার জীবনে এই একমাত্র আকাঙ্খা যে, আমি এমন একটি যন্ত্র চালাইয়া যাইব - যাহা প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট উচ্চ উচ্চ ভাবরাশি বহন করিয়া লইয়া যাইবে। তারপর পুরুষই হোক আর নারীই হউক - নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য রচনা করিবে।' নারী শিক্ষা, নারী প্রগতির কথা অনেক মহামানবেরাই বলেছেন, কিন্তু নারীর পূর্ণ স্বাধীনতা বা পূর্ণ জাগরণের কথা স্বামীজীই প্রথম বলেছিলেন।

স্বামীজি তিনজন রমণীকে তাঁর নিজের জীবনে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছিলেন। তাঁর গর্ভধারিণী মা ভুবনেশ্বরী দেবী, শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের পত্নী শ্রী শ্রী মা সারদা দেবী এবং বিদেশিনী হয়েও যিনি ভারতবর্ষ ও ভারতীয় জীবন নিজের বলে গ্রহণ করেছিলেন - মার্গারেট নোবেল অর্থাৎ ভগিনী নিবেদিতা। প্রাচ্যের নারীদের মধ্যে বিবেকানন্দ দেখেছিলেন মাতৃশক্তি আর পাশ্চাত্যের নারীর মধ্যে কর্মশক্তি। সারদা এবং ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে বিবেকানন্দ দেখেছিলেন, এই প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্যের সমন্বয়। এই দুই রমণীর জীবনদর্শন, মানবতা বোধ, আধ্যাত্মিকতা এবং দৃঢ় আদর্শ বোধই ছিল

মেয়েদের সম্পর্কে স্বামীজীর ধারণা, বিশ্বাস এবং দৃষ্টিভঙ্গী, মেয়েদেরকে তিনি এমন রূপেই দেখতে চেয়েছিলেন, এমনভাবেই গড়তে চেয়েছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন তাতেই মেয়েদের জীবনে সম্পূর্ণতা আসবে।

স্বামীজী বিশ্বাস করতেন আগামী যুগের নারীর মধ্যে থাকবে একাধারে বীরোচিত দৃঢ় সংকল্প ও জননীর স্নেহকোমল হৃদয়। নারী হবে পবিত্রতা, শক্তি ও স্বাধীনতার প্রতীক। তিনি বিশ্বাস করতেন, 'জগতের কল্যাণ স্ত্রী জাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই'।

'হে ভারত ভুলিও না - তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী' এই উক্তির মধ্যে দিয়ে তিনি আসলে মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন অধ্যাত্মশক্তির বলেই মেয়েরা যুগে যুগে পূজিতা, সম্মানিতা। সীতা,সাবিত্রী, দময়ন্তী' শুধুমাত্র তাঁদের পতিব্রতের জন্যই সম্মানিত, তা' নয়, তাঁদের অসামান্য ব্যক্তিত্ব, তেজস্বিতা এবং সহিষ্ণুতার মত গুণই আসলে নারী হিসেবে তাঁদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় করে তুলেছে। আর আধুনিক যুগে তাঁদেরই প্রতিনিধি যেন শ্রী শ্রী সারদা দেবী। অসাধারণ নিষ্ঠার সঙ্গে যিনি জায়া, কন্যা, জননীর ভূমিকা পালন করে গেছেন তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণ সংঘের জননী। এঁরাই হলেন বিবেকানন্দের নারী ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু।

প্রকৃত পক্ষে স্বামীজি মেয়েদের জন্য একটি অত্যন্ত উন্নত জীবনের সন্ধান দিয়েছিলেন, শুধুমাত্র পুরুষের সমতুল্য হওয়া নয়, পরিপূর্ণ বিকাশ আত্মবিশ্বাস অর্জনের মধ্যে দিয়ে নিজের নিজের ভাগ্য নির্ধারণই হবে নারী জীবনের লক্ষ্য এবং তখনই নারীর পক্ষে স্থির করা সহজ হবে, কোন জীবন সে বেছে নেবে। স্বামীজি বিশ্বাস করতেন না, পুরুষই নারীর ভাগ্য নির্ধারণ করে দেবে। বরং বিশ্বাস করতেন যে মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের সমস্যার স্বরূপকে চিনে নিয়ে তার সমাধান করবে এবং তাদের নিজেদের ঐকান্তিক শক্তির উদ্বোধন করে, সমগ্র জগতকে নারীশক্তি তথা মাতৃশক্তির তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত করবে। নারীজাতির জন্য স্বতন্ত্র আন্দোলন করে, তাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে হবে না, তারা নিজেরাই আধ্যাত্মিকতার চর্চার মাধ্যমে, সমগ্র মনুষ্যজাতির সমান শক্তি ও ক্ষমতা অর্জন করবে, শুধু শিক্ষায় যেখানে তারা পিছিয়ে আছে, সেই পুঁথি নির্ভর নয়, জীবন নির্ভর শিক্ষাটুকুই তাদের দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সূত্রঃ চিন্তনায়ক বিবেকানন্দ - সম্পাদকঃ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

আমন্ত্রিত রচনা

স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম ও নীতি

তরুণ গোস্বামী
সিটি এডিটর, স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা

স্বামী বিবেকানন্দ চলে গেলেন ৪ঠা জুলাই, ১৯২১। তাঁর দেহত্যাগের অব্যবহিত পরেই বাংলা জুড়ে আন্দোলন শুরু হল। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব মেনে নিল না দেশবাসী। আন্দোলন এর পর আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠল কলকাতা। রবীন্দ্রনাথ গান লিখলেন রাখী বন্ধন উৎসবের মধ্য দিয়ে ভাতৃত্বের বন্ধনকে দৃঢ় করলেন। এরপর সুরাট কংগ্রেসে নরমপন্থী এবং চরমপন্থীদের মধ্যে সংঘাত শুরু হল। অরবিন্দ ঘোষ পূর্ণ স্বরাজের কথা বললেন। একের পর এক বোমার আঘাতে বৃটিশ প্রশাসন দিশেহারা হয়ে পড়ল। এরই মধ্যে ক্ষুদিরামের ফাঁসি এবং আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দের গ্রেপ্তার চরম আঘাত আনল পরাধীন ভারতের রাজধানী কলকাতার পুলিশ কর্তাদের। ১৯০৯ সালে Morle Minto Reforms এর মধ্যে দিয়ে ভারতীয়দের কিছু বাড়তি সুযোগ সুবিধে দেবার কথা ঘোষণা করা হল। কিন্তু তাতে চিঁড়ে ভিজল না। ১৯১২ সালে কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানী সরানো হল। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠিল। বৃটিশ প্রসাশন দলে দলে যুবকদের বিপ্লব আন্দোলনে যোগদানের কারণ খুঁজতে তৈরী করল Sedition Committee। সেই কমিটি ১৯২৮ সালে লর্ড মন্টেগুকে রিপোর্ট দিল এবং বলল মৃত বিবেকানন্দ জীবিত বিবেকানন্দ চেয়ে অনেক বেশী ভয়ংকর। বিবেকানন্দ হলেন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাক্তি। খুব কৌশলে সাহেবরা বিবেকানন্দকে "প্রফেট" ভগবান বানিয়ে ফেলল। ভগবানের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের কোনও যোগ নেই। ভগবান থাকেন মঠ, মন্দিরে, ফটোর ফ্রেমে বন্দি হয়ে। ধূপ ধুনো দিয়ে তাঁকে পুজো করা হল। গলায় মালা, কপালে চন্দন। লেখা হল না বিবেকানন্দের দেশপ্রেমের কথা, মানবতার কথা। পূজোর মাঝে হারিয়ে গেলেন বিবেকানন্দ। সিস্টার নিবেদিতা ১৯০৬ সালে একটি চিঠিতে জোসেফিন ম্যাকলাউডকে লেখেন "when we, who understood and remember Vivekananda, are dead there will come a long period of obscurity and silence for the work he did. It seems to have forgotten them suddenly in 150 to 200 years it will be found to have transformed the West." হারিয়ে যাবেন বিবেকানন্দ এবং নিঃস্তব্ধতার

মধ্যে তারপর তিনি ১৫০ থেকে ২০০ বছরের মধ্যে জেগে উঠবেন - এই ছিল সিস্টারের বিশ্বাস। স্বামীজী নিজে বলেছিলেন যখন ফিরে আসব এই সমাজে বোমার মত ফেটে পড়ব এবং সমাজ আমাকে কুকুরের মত অনুসরণ করবে - "when I shall come again I shall burst on your society like a bombshell and it will follow me like a pet dog." রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন আমাদের যুবকদের মধ্যে যে দুঃসাহসিক অধ্যাবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে আছে বিবেকানন্দের বাণী।

কি ছিল স্বামীজীর বাণীর মধ্যে যা প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে যুবকদের ডেকে ছিল? তাদের ছুঁয়ে গিয়েছিল?

১৯০১ সালে স্বামীজী ঢাকাতে আছেন। সারাদিন অসংখ্য মানুষ তাঁর সাথে দেখা করতে আসে। যুবকেরা আসে, তারা স্বামীজীর কাছ থেকে নতুন কিছু শুনতে চায়। এমনি একদিন -জগন্নাথ কলেজের কয়েকটি যুবককে নিয়ে স্বামীজীর কাছে হেমচন্দ্র ঘোষ গেছেন। স্বামীজীর সঙ্গে নানা বিষয়ে গভীর আলোচনায় মেতে উঠেছে যুবকেরা। স্বামীজী তাদের কথা শুনছেন মাঝে মাঝে মন্তব্য করছেন। কথা প্রসঙ্গে যুবকেরা জানতে চাইল সন্ন্যাস জীবনের কথা, কি খাদ্য খাওয়া উচিত - আমিষ না নিরামিষ, কিভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করা যায় ইত্যাদি। স্বামীজী শুনছিলেন। খুব বিরক্ত তা তাঁর চোখে মুখে ফুটে বেরুচ্ছিল কিন্তু তবুও ছেলেদের কথা মন দিয়ে শুনছিলেন। হঠাৎ রেগে গিয়ে বললেন "শোন পরাধীন জাতের মাতৃশ্রাদ্ধের কোনও অধিকার নেই। যে লুঠেরারা তোদের মাকে অত্যাচার করছে তাদের দেশ থেকে তাড়া। দেশের মানুষকে free declare করতে বল। বৃটিশ পুলিশ গুলি চালাক। দেশে রক্তগঙ্গা বয়ে যাক আর তার প্রথম বুলেটটা এসে লাগুক আমার বুকে।" ঘরে পিন পতন নিঃস্তব্ধতা। স্বামীজীর সমস্ত দেহ থেকে তেজ ফুটে বেরুচ্ছে। বললেন " আগামী ৫০ বছর দেশমাতা তোদের একমাত্র আরাধ্য দেবী হোন। বাকি সব অকেজো দেবতা এখন ফেলে রাখলেও চলবে।।" স্বামীজী যুবকদের আত্মবিশ্বাসী হতে বললেন। গণেশ সখারাম দেউসকরকে তিনি বলেছিলেন গোটা দেশ একটা বারুদের স্তুপের ওপর বসে আছে। শুধু একটা আগুন জ্বালিয়ে দেবার অপেক্ষা। বিবেকানন্দ সে আগুন জ্বেলে দিয়েছিলেন। প্রথমবার পাশ্চাত্য থেকে ফেরার পরে উৎসাহী যুবকেরা তাঁর ঘোড়ার গাড়ীর ঘোড়া খুলে দিয়ে নিজেরাই সে গাড়ি টেনে নিয়ে গিয়েছিল প্রথম মাদ্রাজে এবং কলকাতাতেও সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হল। স্বামীজী গোটা দেশকে জাগিয়ে দিলেন, সত্যিই ফেটে পড়লেন বোমার মত। একের পর এক বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান তৈরী হল যারা সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখল।

দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার অন্যতম আসামী ছিলেন রাজেন লাহিড়ি। তাঁর ফাঁসী হয়েছিল। জজসাহেব যেদিন আদালতে মামলার রায় এবং রাজেনের শাস্তির কথা

শোনালেন তিনি আদালত কক্ষে নির্বিকার। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। ফিরে এলেন আলিপুর জেলে। মৃত্যুর দিনক্ষণ জেনে গেছেন। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে উচ্চৈস্বরে বিবেকানন্দের বাণী পাঠ করতেন রাজেন। একদিন বৃটিশ জেলার এসে তাঁকে বললে কি ব্যাপার বলত? তোমার মৃত্যুদণ্ড হয়েছে, আগামী মাসে তুমি মারা যাবে কিন্তু তোমার কোন ভয়ডর নেই। তোমার দেহের ওজন বাড়ছে, মনে এত স্ফুর্তি আর তুমি রোজ একটা বই থেকে কি একটা আবৃত্তি কর এসব কি করে হচ্ছে? রাজেন ধীর ভাবে সাহেবকে উত্তরে বললেন তিনি বিবেকানন্দের বাণী সবাইকে শুনিয়ে যেতে চান কারণ এই বাণী তাদের মৃত্যুভয়কে জয় করতে শেখাবে, তাদের দাঁড় করিয়ে দেবে জীবনের সামনে। এই বাণী একদিন বৃটিশকে তাড়াতে যুবকদের সংগঠিত করবে।

একটি চিঠিতে স্বামীজী তাঁর গুরুভাই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখেন আমি একটা আগুনকে বহন করে বেড়াচ্ছি। দুঃখের বিষয় এই, তোমরা কেউ সেই আগুনটাকে ছুঁতে পারছনা। তোমরা হিংসা এবং দ্বেষের পথে এখনো হাঁটছো। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি তোমরা যেন সেই আগুনটাকে ছুঁতে পার। নিজের জন্মের সার্ধশতবর্ষ পরে এই আগুন জ্বালাতেই বিবেকানন্দ ফিরে এলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের ভবিষৎ প্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন ও ওর মেধা ও অধ্যাত্মিক শক্তিতে একদিন জগতের ভিত কাঁপিয়ে দেবে। বিবেকানন্দ আগুন জ্বেলে দিলেন তাঁর প্রিয় মাতৃভূমির যুবকদের মধ্যে। বিবেকানন্দ চলেছেন আমেরিকার উদ্দেশ্যে। জাপানে ইয়াকোহামা শহরে ওরিয়েন্টাল হোটেলে আছেন। সেখান থেকে চিঠি লিখছেন তাঁর মাদ্রাজী বন্ধুদের ''ভারতবর্ষ মানুষ চায় এমন মানুষ যারা দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে, তাদের অসহায় মুখে অন্নদান করবে, তাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটাবে, আর তোমাদের পূর্বপুরুষের অত্যাচারের ফলে যারা পশু পদবীতে উপনীত হয়েছে তাদের উন্নতির জন্য আমরণ চেষ্টা করবে।''

চিকাগো ধর্মমহাসভায় বিখ্যাত বিবেকানন্দ। বাগ্মী, ইতিহাসবিদ, ইতিহাস রচনাকারী তিনি। ১৮৯৩ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর 'ধর্ম ভারতের একমাত্র চাহিদা নয়' - বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বললেন ভারতবর্ষে মানুষের ধর্মের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন রুটির। দেশের মানুষ যখন রুটি চায় আমরা তাদের তা দিতে পারিনা। একটি অভুক্ত মানুষকে ধর্মের কথা গেলানো মানে তাকে অপমান করা। সমস্ত সভাগৃহে স্তব্ধ। স্বামীজীর কথা শুনে অনেকের চোখে জল।

মাদ্রাজী শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলকে চিঠিতে স্বামীজী লিখেছেন "feel my children feel; feel for the poor, feel for the outcast, feel for the downtrodden. Feel in such a way so that your heart stops, your head reels and you feel as if you will go mad." অনুভব কর মানুষের জন্য।

স্বামীজী কেন ফিরে এলেন? তাঁর বাণী এতটাই ইতিবাচক যে এখনকার পৃথিবীর মানুষ অনুভব করছে তাঁর কথাই আমাদের বাঁচাতে পারে। বিবেকানন্দ সগৌরবে ঘোষণা করলেন আমি সেই দেবতার পূজারী অজ্ঞেরা যাকে ভুল করে মানুষ বলে ডাকে। বললেন "আমার পাপী নারায়ণ আমার তাপী নারায়ণ আমার লুচ্চা, বদমায়েশ, গুণ্ডা নারায়ণ। একটি চিঠিতে লিখলেন " পড়েছো পিতৃদেবো ভব, মাতৃদেবো ভব। আমি বলি দরিদ্রদেবো ভব মূর্খদেবো ভব। দরিদ্র, অজ্ঞান, মূর্খ, কাতর ইহারা তোমার দেবতা হউন। এদের সেবাই পরমধর্ম জানবে।"

যে অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি তা খুব একটা ভাল কিছু আমাদের দিচ্ছে না। মানুষ নিজেকে নিয়ে এতটাই বিচলিত যে কোনও অবস্থাতে সে নিজেকে নিয়ে আনন্দিত, পরিপূর্ণ হতে পারছেনা। সবসময় একটা অজানা ভয় তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। ঘর সংসার, মোটা মাইনের চাকরি, নাম, প্রতিষ্ঠা, ক্লাব, বন্ধুবান্ধব সব থেকেও সে যেন বড় একা, নিঃসঙ্গ। প্রতিদিন সে অন্ধকার, আরও অন্ধকার আর্বতে প্রবেশ করছে। বাঁচবার পথ একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী Desmond Morris তাঁর গ্রন্থ "The Human Zoo" তে লিখেছেন আগামী প্রজন্মের মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠবে কারণ তার চারপাশে বেশ কিছু মানুষকে তারা দেখবে যারা নির্লজ্জভাবে স্বার্থপর; সুখের সংসার ভেঙ্গে তছনছ করে দেবে, নিজের আখের গোছাতে মানুষকে মেরে ফেলতেও পিছপা হবে না - এমন মানুষ গিজগিজ করবে চারদিকে। নিরস, দাম্ভিক, অত্যাচারী, কপট মানুষ।

মানুষ তো বাঁচতে চায়। বাঁচার পথ খুঁজতে খুঁজতে সে পেল বিবেকানন্দকে। দেখল স্বামীজীর ধর্মে নেতিবাচক বলে কিছু নেই। অধিকাংশ ধর্মের অনুশাসনই নেতিবাচক। ওটা কোরো না, ওখানে যাবে না, ওভাবে কাজ করবে না, ওর সাথে মিশবে না - বিবেকানন্দের ধর্ম ইতিবাচক এবং সার্বজনীন। সেই ধর্মের দেবতা মানুষ। নানা মতের, নানা পথের, নানা বিশ্বাসের মানুষ। যিদের জ্বালায় ছটফট করা মানুষ। ভাগ্যতাড়িত, যন্ত্রণায় দিশেহারা করা মানুষ। অপমানিত, লাঞ্ছিত, শোষিত, অবহেলিত, অত্যাচারিত মানুষ। জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত মানুষ যে দুপা এগোয় আর চার পা পিছিয়ে যায়। হতাশ, নিজের প্রতি আস্থা হারানো এক দেবতা। এই দেবতাকে পুজো করার নাম ধর্ম। বিবেকানন্দকে তাঁর গুরু মানুষ চিনিয়ে দিয়েছিলেন। কোষ্টিপাথরের দেবতাকে চেনাননি। বিবেকানন্দ দেখেছিলেন রক্তাক্ত এবং অশ্রুময় ভারতবর্ষকে। আবিষ্কার করেছিলেন ভারতবর্ষকে। ইংরেজরা যে ভারতের সদা নিন্দে বান্দা করে, বলে এটা একটা চোরের, অলস মানুষের দেশ বিবেকানন্দ সেই দেশের জীবনযাত্রার মধ্যে খুঁজে পেলেন পৃথিবীকে বাঁচানোর মন্ত্র। ভারতবর্ষের শাশ্বত মর্মবাণী শুনলেন - সব কিছু দিয়ে

দাও। বিনিময়ে কিছু চেয়ো না। ভারতবর্ষের জীবনযাত্রার মূল বাণী মানুষের প্রতি আগ্রাসী ভালোবাসা। এটাই ভারতের নীতি।

বিবেকানন্দের সঙ্গে ফরাসী সাহিত্যিক কিমো এঁভ্যার পরিচয় হয়েছিল রোমা রোঁলার বই এর মাধ্যমে। এঁভ্যা একবার এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে ওঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হল। হাসপাতালে দিন কাটে একা একা। যে বন্ধু এবং আত্মীয়েরা আসেন সকলেই শোনান রোগের নানা কাহিনী। একসময় এঁভ্যার মনে হল তিনি আর কোনদিনই সুস্থ হবেন না। দিন দিন মানসিকভাবে তিনি হেরে যেতে লাগলেন। আধো আধো জাগা অবস্থায় এঁভ্যা একদিন দেখেন সামনে বিবেকানন্দ দাঁড়িয়ে, মুখে হাসি। এঁভ্যার খুব অভিমান হল। তিনি অসুস্থ আর বিবেকানন্দ হাসছেন। স্বামীজীর দেহ বড় হতে লাগল। মুখে হাসি কিন্তু বুকের মাঝে গভীর ক্ষত। মানুষের প্রতি অত্যাচার, অবজ্ঞা, নিপীড়ন গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। তারপর স্বামীজীর সেই পরিচিত ঘন্টাধ্বনির মত কণ্ঠস্বর - " হেরে যেও না। থেমে থেকো না। লড়াই চালিয়ে যাও। মনে রাখবে আমাদের জিততেই হবে। ভয় কি আমি ত সাথে আছি।" এঁভ্যা চমৎকৃত। কি শুনলাম কানে - এ যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছি না। কিন্তু কোথায় সেই অজানা মৃত্যুভয় হারিয়ে গেল। বিকেলে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়রা এসে দেখেন এঁভ্যা সেই আগের মতই প্রাণবন্ত, সজীব একজন মানুষ। তাঁরা খুশী হলেন। এর কিছুদিন পরে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন এঁভ্যা। তাঁর পুনর্জন্ম ঘটে গেছে। চলনে, বলনে কথায়, বার্তায় চূড়ান্ত আত্মবিশ্বাস প্রকাশ পাচ্ছে। নতুন মানুষে রূপান্তরিত হলেন এঁভ্যা।

একে বলে বিবেকানন্দের ম্যাজিক আর এই ম্যাজিককেই ভয় পেত ইংরেজরা।

বিবেকানন্দ বাঁচার নতুন মন্ত্র দিলেন। বাঁচো সবাইকে নিয়ে বাঁচো। কলকাতায় রাজা নবকৃষ্ণদেবের শোভাবাজার রাজবাড়িতে প্রথমবার পাশ্চাত্য থেকে ফিরে আসার পরে স্বামীজীকে সংবর্ধনা জানানো হল। স্বামীজী তাঁর ইংরেজী ভাষণে বললেন - " We must go out, show life or fester, degrade and die. Nothing short of it is my ideal." ভারতবর্ষ পাশ্চাত্যকে জীবনের শিক্ষা দেবে, বেঁচে থাকার শিক্ষা দেবে। রোমা রোঁলা তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনীর ভূমিকায় লিখেছেন - পাশ্চাত্যের মানুষ রাতের নিদ্রা ত্যাগ করেছে, আমি তাদের শুকনো ঠোঁটগুলিতে রামকৃষ্ণের অমৃত দিয়ে ভিজিয়ে দিতে চাই। আমাদের চারদিকের বৈভব, বিলাসিতা, আমোদ আহলাদ, নাম, যশ, প্রতিপত্তি, অর্থ আমাদের আনন্দ দিতে পারছিল না। হেরে যাবার ভয় আর মৃত্যুভয় আমাদের কুরে কুরে খাচ্ছিল। আমরা মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলাম। বাঁচাবার পথ খুঁজতে গিয়ে পেলাম বিবেকানন্দকে যিনি বলেন আমাদের অতীত ছিল গৌরবের আর ভবিষৎ আরও গৌরবের হবে। যিনি বলে ছিলেন সাহায্য দাও। সেবা

দাও তোমার যা আছে তুমি দিয়ে দাও। সাবধান! বিনিময়ে কিছু চেয়ো না। যিনি ঘোষণা করলেন আমার পাশ্চাত্যের প্রতি একটি বাণী আছে যেমন বুদ্ধের পূবের প্রতি একটি বাণী ছিল।

সেই বাণী হল তুমি তোমার ধর্মকে ছেড়ো না। ধর্ম মানে মানবধর্ম। এমন কিছু কোরো না যাতে মানবতা কলুষিত হয়। স্বামীজী বললেন যেখানে জ্যান্ত ঠাকুরের পুজো হয় না সেখানে জপ, তপ, ঠাকুরঘর সব বৃথা। বললেন "বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর" বেলুড় মঠে খুব যত্ন করে সাওঁতাল কুলী যারা মঠ নির্মাণের কাজে ছিল তাদের খাওয়ালেন আর বললেন আজ আমার সত্যকারের ভগবানের পুজো হল।

স্বামীজী যে সার্বজনীন ধর্মের কথা বললেন সেই ধর্মকে কিভাবে বাস্তবে রূপ দেওয়া যায়? স্বামীজী বললেন একটি নীতিকে অনুসরণ কর। নীতিটি কি - " তোমরা এস। তোমাদের সব দুঃখ আমার ওপর উজাড় করে দাও। তোমরা সুখী হও আর ভুলে যাও আমি তোমাদের মধ্যে কোনকালে ছিলাম। Bertrand Russell এর ভাষায় "To feel one with the stream of life" জীবনের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলা। দুহাতে জীবনকে গ্রহণ করা, জীবনকে ভালবাসা, জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়া নয়।

মানুষের প্রতি আগ্রাসী ভালবাসাই বাঁচাতে পারে আমাদের সভ্যতাকে। আমি ভালবাসব, এটাই আমার ধর্ম - এই নীতি আমাদের জীবনযাত্রায় নতুন মাত্রা যোগ দিতে পারে। Russell আধুনিক সভ্যতার কৃত্রিমতাকে সমালোচনা করে বলেছেন "Those who have loved cannot sell it and those who want love cannot get it from the market " এমন এক অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি যেখানে অভাব ভালবাসার। আর ভালবাসা নেই বলেই সব থেকেও কিছু নেই। বিজ্ঞানের অগ্রগতি, প্রযুক্তির উন্নতি মনে শান্তি দিতে পারছে না আর না পারার কারণই হল নিঃস্বার্থ ভালবাসার অভাব।

স্বামীজী যে নীতিতে বিশ্বাস করেছেন সেটি হল নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়া। "মৃত্যু যখন নিশ্চিত তখন মানুষের জন্য কাজ করে মরাই ভাল। নিঃস্বার্থ কাজ হল জীবনের একমাত্র নীতি। কিন্তু আমরা তা কি করি? আমরা যে কাজ করি সেখানে কাজের নামে নিজের ঢাক পেটাই; কাজের চেয়ে ফলের কথা বেশী ভাবি আর তাই ছুতোয়-নাতায় আমাদের সীমাহীন অহংকার ফুটে বেরোয়। নিজেকে সর্বদা শ্রেষ্ঠ প্রমানের চেষ্টা। কোন কিছু না জানলে মনে হয় তাই তো? হেরে গেলাম। এই চিন্তা থেকে যাবতীয় মানসিক যন্ত্রণার সৃষ্টি। যখন কোনও বোঝাই নেই, তখন নিজেরাই নিজেদের কাছে বোঝা হয়ে উঠি। জীবনে কোনও আনন্দ নেই, কোনও ছিরিছাঁদ নেই।

অহংকার বাড়ানোর কাজ আর কাজ। তারপর একসময় ক্লান্তি আসে। তখন দেখা যায় নানা রোগ যেখানে একাকিত্ব, depression এবং উৎকণ্ঠা মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। ডাইবিটিসে স্বামীজীর একটি চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, দুটো কিডনি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যেদিন মারা যাবেন বিকেলে ভ্রমণে বেড়িয়ে গুরুভাই স্বামী প্রেমানন্দকে বললেন একটি নির্দিষ্ট স্থান দেখিয়ে ওখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে।

কাজ আর কাজ। ভালবেসে, অপরের মুখে হাসি ফোটাতে কাজ করা স্বামীজীর এই নীতি ব্যাপকভাবে নাড়া দিয়েছে পাশ্চাত্যকে। আমেরিকায় সন্ন্যাসীদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বক্তৃতা করতে। স্বামীজীর কথা মানুষ শুনতে চাইছে। চাইছে মানুষের জন্য কাজ করে নিজের জীবনে পূর্ণতা আনতে। stress management এর কথা। কাজ কর অন্যের জন্য তবে স্নায়বিক চাপ কমবে। স্বামীজী বললেন যাক না একটা জীবন experiment করে। বললেন জীবন মানেই লড়াই। লড়াই ত বটেই। স্বার্থপরতা, নীচতা হীনমন্যতা পরশ্রীকাতরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। নিজেকে আরও সুন্দর করার লড়াই।

সার্বজনীন বোধ ও ভালবাসার নীতি পারে আমাদের বাঁচাতে। ভারতবর্ষের চিরকালীন মন্ত্র দিয়ে দাও আর কিছু চেয়ো না তখন বহু মানুষের জীবনের মূলমন্ত্র হয়ে উঠেছে। নিজের মত করে বহু মানুষ সেবার কাজে অংশ নিচ্ছেন। ত্যাগ ও সেবা পারে জীবনে নতুন ছন্দ আনতে। নিজের অহংকার আর স্বার্থপরতা ত্যাগ আর অন্যের কষ্ট কমাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। বিবেকানন্দ যুবকদের বললেন জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছ তোমার কি নিদ্রা সাজে? সত্যিই জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। বিবেকানন্দের কথা রাশিয়ান পণ্ডিত ই.পি. চেলিশেভ তাঁর Vivekananda: humanist, patriot and democrat-এ বলেছেন বিবেকানন্দ তাঁর দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে চিরদিন লড়াই চালিয়ে যাবেন। এক বিশাল পাহাড়ের মত তিনি দেশকে আগলে রাখবেন। যারা অত্যাচারী, দাম্ভিক, মানুষের ওপর নিজের মত চাপিয়ে দেয়, বিবেকানন্দের এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এই সংগ্রামে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর হাতে হাত মিলিয়ে শোষণহীন সমাজ গড়তে নেমেছে।

(১) পত্রাবলী - উদ্বোধন কার্যালয়

(২) বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ - শঙ্করীপ্রসাদ বসু, মন্ডল বুক হাউস

(৩) Swami Vivekananda : New discoveries : His Second visit to the West - Maric Lois Bunke, Advaita Ashram

(৪) Mortals and other essays - Bertrand Russell, Rupa

(৫) Human Society in ethics and politics - Bertrand Russell, Routledge

Invited Article

The Clarion Call

Dr. Joy Bhattacharyya
Lecturer in Indology and I.U.H.H. (UNESCO-approved)
The Ramakrishna Mission Institute of Culture,
Golpark, Kolkata-700 029

We are all aware that the Gita contains message of Sri Krishna. The Gita entails the sum and substance- the milk of the Upanished - the cow. According to Swami Vevekananda, essence of the Gita is again present in the following single verse;

Klaivyam māsma gamah Pārtha
Naitat tvayyupapadyate

(2.3)

Lord Krishna suggests to Arjuna here to have courage and strength and to give up unmanliness. Swami repeatedly asserts that courage and strength together constitute virtue (Dharma) and Krishna suggests therefore to Arjuna to be virtuous through being courageous and strong. Fear and weakness constitute vice (Adharma), as Swamiji asserts very much. What is the crying need is to have courage and strength instead of fear and weakness.

Does the above message of the Gita stand the test of Shruti or the heard text? The answer is obviously in the positive. Our attention here is immediately drawn towards the following words in the Mundaka Upanishad :

Nāyamātmā balahinena labhyo

(3.2.4)

One who is weak is not able to realize the truth, the self. We are now in a position to state the sum and substance of Swamiji's message. That is strength, strength and strength alone. When one is strong, there is hope no doubt. When one is

courageous, there are possibilities no doubt,. The Swami is dead against ideas leading to cowardice. 'Be a hero, otherwise you are a big zero' - that is perhaps the spirit prevalent in his message. This idea, needless to say, can well be substantiated by quoting his words available at random in different volumes of the Complete Works. But we are not going to do that for the sake of brevity.

This is an important point to be noted in this connection that Swamiji's message of strength holds good for all, the young person in particular. Swamiji, as it were, symbolizes youth. It may be mentioned that he passed away at the age of 39 only. Though in his last days he had certain physical troubles due to overstrain, yet he was quite strong and stout unlike many.

He was not only physically strong, but he was also mentally sound. 'Sound mind in a sound body' - this principle got personified in Swami Venekananda. He would very often desire his countrymen to have a sound mind in a sound body,. It is easy to understand that Swamiji's desire in this context can be fulfilled by the young persons fully.

How to make a body sound? Swamiji emphasises eating of mutton instead of vegetables. He points out that one should have an 'Islamic body ' which in his eyes, is strong enough. For the sake of body - building, one should also have recourse to physical exercises as he would also have. One should also give up certain bad habits for keeping the body fit.

But is the sound body everything? A materialst thinker holds necessarily that the body is absolutely one with the self. But Swamiji is not a materialist, he is instead a Vedantin, particularly an Advaitin. He therefore believes in a self over and above the body. In this context certain points need futher elucidations.

As an Advaitin Swamiji believes also in the absolute identity of self and God (Brahman). Brahman is Infinite Existence - Infinite Consciousness - Infinite Biiss. Self being no other than Brahman is obviously infinite in all respects. Swamiji has therefore repeatedly pointed out that each soul is potentially divine and the point is only to realize the truth. That these words of Swamiji are in conformity with the basic tenets of Advaita Vedanta and that these words give enourmous strength to one's mind go without mention. We may hold that Swami Vivekananda is an Adaitin as his great master, Sri Ramakrishna, desired him to be. In order to show excellence of Advaita Vedanta we may also make a brief reference to some other theories about Jiva and God. Nyaya and Vaishesika are two allied systems and the systems are theistic. Nyaya-Vaishesika Theism draws difference between Jiva and God. The individual self (jiva) and God or the Supreme Self are never one at any stage. According to the systems, the individual self, when liberated, is not also equated with God or the Supreme Self. God is the only All-knowing, All-powerful Being. Man, when liberated, is only absolutely free from pain. He is neither all-knowing nor all-powerful.

Samkhya-yoga are two allied systems with some differences of course. Samkhya does not believe in God, while the Yoga system does.Yoga is therefore said to be theistic Samkhya. The point to be considered here is the Yoga draws a distinction between the individual selves (*Purusha)* and God, God is said to be special *Purusha* or *Purushavishesa*. God is endowed with certain features when the other *purushas* are not. God is never under bondage, the other *purushas* should meditate on God for liberation.

Ramanuja is an advocate of Qualified Monism under the umbrella of Vedanta. His philosophical doctrine is therefore called Vishistadvaita. Both Shankara and Ramanuja are Monists, according to whom the Reality (Brahman) is one without a second. But Ramanuja is of the opinion that the

individual selves (jiva) are only parts of Brahman. Ramanuja therefore believes in the distinction of part and whole (*svagata bheda*) in Brahman. As a pure monist Shankara does not admit of any kind of distinctions in Brahman including the aforesaid one. He therefore declares the absolute oneness between self and Brahman.

Swami Vivekananda is also an uncompromising believer in Advaitism. He therefore gives his message and encourages everybody irrespective of caste, creed, sex, language and so on. He says that ascertainment of the oneness with Brahman or God will give enormous strength to the mind. This great idea will make us fearless and courageous to do anything. This is thus he describes, the Vedantic brain. The synthesis of Islamic body and a Vedantic brain will do lots of good for the good of mankind, Swamiji emphasises. In this connection he is much hopeful about the young generation rather than those advanced in age.

With reference to the above, we are certainly reminded of Swamiji's thought about religion. 'Be good and do good' - that is all about religion, he says. Religion is estimated in different ways by different persons, eastern and western. Some have even suggested to give up religion in view of oppressions made in different corners of the world in the name of religion. But Swamiji's estimate of religion is positive enough. Like his master he has also realized that every religion leads to the same truth. Let there be so many religions or religious faiths. All these religions should fall under one Religion (with Capital R). Religion when sincerely practised makes one good and to do good to others. Otherwise that is no religion. Like his Master Swamiji acknowledges supremacy of spirituality over religions. Religion with Capital R is in tune with perfect spirituality. Having kept this point in mind Swamiji suggests that it is good to be born in a temple or a church but it is bad to die there. His basic idea is that one should ultimately realize the truth that is beyond religion, temple and churches, the religious scriptures and so

on. To transcend all these is the ultimate goal of life.

Swamiji's idea of religion assures us at once that such a religion can never be antagonistic to humanity. There can never be oppression of man by man in the name of religion, as Swamiji views the same. Swamiji says also that religion is manifestation of divinity already in man. When one has manifested divinity one is obviously good and one does also good to others, because divinity excludes vice.

Swamiji in fact encourages all forms of activity revealing divinity. Art and culture, music and philosophy, sports and games - Swamiji is in favour of all these. The only reason is that through all these the divine in man gets manifest. Sports and games give one benign joy, art and music make one close to God. Hence Swamiji encourages man and woman to do what is condusive to the manifestation of what is good or divine in him.

'Swamiji has actually given up the so-called distinction between the 'spiritual' and 'secular'. Our work can be spiritualized in the form of service to mankind. Swamiji emphasises this idea of service to mankind since, from the Advaita point of view, service to mankind is service to God. For the sake of such a service to mankind we should first be good. Then only we can do good to others. To be good and to do good of course requires no temporal gap. Swamiji therefore suggests - Be and make. Being and making are a simultaneous process.

In this connection we are certainly reminded of the man-making education as conceived of by Swamiji. Education, according to him, means the manifestation of perfection already in man. Man being no other than God is indeed perfect. Manifestation of perfection already in man is the be-all and end-all of education. Education in various forms is actually taken into consideration by Swamiji. The ideal of a sound body

indicates physical education to be there. Art, painting, music etc. do also help one to develop the lofty emotions, imaginations and ideals within. Those therefore must be given proper place in education. Thus education, in a broad sense, manifests perfection already in man. Education for this reason is the crying need, as Swamiji repeatedly tells us. To be a perfect academician is not necessarily to be a good man. Through education in various spheres mentioned earlier, the noble and lofty qualities in man can be revealed. Then only one is educated in the true sense.

To conclude we may go back to the introduction. Swamiji makes his clarion call to the young generation by and large. The young generation should get rid of physical and mental weaknesses and give up unmanliness. He has to be strong, But his strength must not be misused through its employment for destruction. When religion tells us to be good and do good, the only task to be taken up heart and soul is constructive. This constructive work necessarily includes service to mankind. Charity begins at home, as Swamiji also asserts. One should serve one's home, one's locality, one's town or village, one's state, one's country and family the world. Through one's deeds one should thus serve God. Realization of the Highest Truth through service is what Swamiji preaches time and again.

সম্প্রীতির সেতু স্বামী বিবেকানন্দ

ডঃ মমতাজ বেগম
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

বিবেকানন্দ এমন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি সম্প্রীতির সেতুর মত। এই সম্প্রীতি আসে শিশু বয়সের শিক্ষা থেকে। কোরানে আছে - শিশু বয়সের শিক্ষা পাথরে খোদাই করা অক্ষরের থেকেও গভীর। শিশু প্রথম পরশ পায় মায়ের। পিতার আদর্শ ও ব্রত শিশুর জীবনে দ্বিতীয় পাঠ হিসাবে চিহ্নিত। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর মায়ের আচার আচরণ, শিক্ষা দীক্ষা থেকেই জীবনের প্রথম পাঠ শুরু করেন। তিনি এমন একজন মাকে পেয়েছিলেন যিনি যথার্থ শিক্ষিতা, দয়ালু, তেজস্বিনী, সুগায়িকা ও সহনশীলা নারী। তাঁর দশটি সন্তান তাদের মধ্যে পাঁচটি পুত্র, পাঁচটি কন্যা। এই সমতা ও সাযুজ্যতা দেখেই বড় হয়েছেন বিবেকানন্দ। মায়ের সঙ্গে আত্মিক গভীরতা থাকার কারণে মায়ের সুখ-দুঃখ হাসি কান্না স্পর্শ করতো তাঁকে। ভুবনেশ্বরী দেবী একাধিক সন্তানের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছেন। সুতরাং মা ভুবনেশ্বরীর জীবনে মৃত্যুর এক দীর্ঘ মিছিল চলেছে। কিন্তু কখনই তিনি দুঃখে আটকে পড়েননি, দুঃখ অতিক্রম করেছেন।

বিবেকানন্দের সমগ্র জীবন থেকে মূলত তিনটি ভাবনাকে আমরা আলোচনার মূল স্রোতে আনতে চাই -

ক) মাতৃভাবনা ও নারী ভাবনা

খ) ধর্ম ভাবনা

গ) জাত - পাত সম্প্রদায়গত ভাবনা।

এগুলির মধ্যে দিয়ে সম্প্রীতির সেতু বাঁধতে চেয়েছেন। সমস্যা সঙ্কুল ভারতবর্ষে এগুলির মধ্যে দিয়ে মানবিকতার উদ্বোধনই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য।

মায়ের আদর্শই ছিল বিবেকানন্দের নারীর প্রতি সম্ভ্রমবোধের মূল শিক্ষা। তিনি বলেছেন - যে মাকে সত্য সত্য পূজা করতে না পারে, সে কখনও বড় হতে পারে না।

নারীকে অবহেলা নয় তাকে মনুষ্যত্বের মর্যাদা দিতে হবে। তবেই গঠিত হবে সুস্থ সতেজ ভারতবর্ষ। পিতা মাতার মধ্যে দিয়েই তিনি চিনেছেন ভারতবর্ষের স্বরূপকে।

ডানপিটে দুরন্ত বিলে বা বীরেশ্বরের কঠিন কৌতূহলকে আনায়াসে নিবারণ করতেন মা। তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছিলেন সুর-স্বর শিক্ষা, সংযম এর পূর্ণাঙ্গ পাঠ। বিবেকানন্দের কানে ধ্বনিত হতো মায়ের কথা 'আজীবন পবিত্র

থাকিয়ো, নিজের মর্যাদা রক্ষা করিও, কখনও অপরের মর্যাদা লঙ্ঘন করিও না, খুব শান্ত হইবে, কিন্তু আবশ্যক হইলে হৃদয় দৃঢ় করিবে।'

এই কঠোরে কোমলে ভাবমূর্তি দিয়েই বাংলাদেশের মেরুদণ্ডহীন, ব্যক্তিত্বহীন কুসংস্কারগ্রস্থ মেয়েদের স্বনির্ভর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারীতে পরিণত করতে চেয়েছেন তিনি। ভারতবর্ষের অর্ধেক আকাশ যখন মেঘাচ্ছন্ন তখন আলো আনার জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তৈরী করার জন্য নিবেদিতাকে একটি চিঠিতে লেখেন। --

"ভারতের বিশেষত ভারতের নারীসমাজের জন্য পুরুষের চেয়ে নারীর একজন প্রকৃত সিংহিনীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখন মহীয়সী নারীর জন্ম দান করতে পারছে না। তাই অন্য জাতি থেকে তাদের ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, তোমার ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা অসীম ভালবাসা, দৃঢ়তা, সর্বোপরি তোমার ধমনীতে কেলটিক রক্তের জন্য তুমি ঠিক সেইরূপ নারী, যাকে আজ প্রয়োজন।"[১]

পিতা মাতার উদার ধর্মবোধ বিবেকানন্দকে সম্প্রীতি ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান উচ্চ নীচ কোনো বিভাজন না করে উপেক্ষিত অজ্ঞানতায় নিমজ্জমান মানুষকে উদ্ধার করতে চেয়েছেন তিনি।

নিজের দেশ পরিভ্রমণ করতে করতে কখনো রাজার প্রাসাদে কখনো গাছতলায় কখনো পিতার বৈঠকখানায় হিন্দু মুসলমান খৃষ্টানের চুরুট পরীক্ষা, কখনো মেথরের কল্‌কে থেকে তামাক খেয়েই নিজের সঙ্কীর্ণতা ও ভেদবুদ্ধি দূর করে ফেলেছেন। প্রাচ্য দেশ অশিক্ষায় কুসংস্কারে জীর্ণ আর বিদেশ ভোগে ক্লান্ত -বিভ্রান্ত। এই দুই প্রান্তকে সম্প্রীতির বন্ধনে বেঁধেছেন তিনি। কারণ তিনি বিশ্বমানবের দীক্ষা নিয়েছেন। বিদেশী চরিত্র ম্যাক্সমুলার, জে জে গুডউইন, জন হেনরি সেভিয়ার প্রমুখের আদর্শ মিশেছিল তাঁর রক্তে। তাই সকলকে মিলিয়ে তিনি এক করতে পেরেছেন। বীরেশ্বর ওরফে বিবেকানন্দ যখন খুব ছোট তখন বিশ্বনাথ ভুবনেশ্বরী দেবীর নামে কারবালা ট্যাঙ্ক লেনের কাছে একটা দরগা কিনলেন, এছাড়া আপার সার্কুলার রোডে মানিকপীরের দরগা ও তার চারপাশের জমি ভুবনেশ্বরী দেবীর নামে কিনলেন। এই সময় মুসলমান প্রজাদের সঙ্গে তাঁর একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দত্তনিবাসের সদরে সব সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা বসত আর ভুবনেশ্বরীকে বিবেকানন্দ অনুরোধ করতেন 'মা, কারবালার গল্প বল না, ভুবনেশ্বরী হাসান হোসেনের কাহিনী বলতেন আর সকলের চোখে টলটল করত জল। তিনি একমনে উচ্চারণ করে চলেছেন।

"রে পথিক ! রে পাষাণ হৃদয় পথিক! কি লোভে এত এস্তে দৌড়িতেছ? কি আশায় খণ্ডিত শির বর্শার অগ্রভাগে বিদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতেছ? এ শিরে হায় ! খন্ডিত শিরে তোমার প্রয়োজন কি? সীমার ! হোসেন তোমার কি করিয়াছিল? একটু দাঁড়াও।"

রামায়ণ মহাভারত পুরাণ ইসলামের কাহিনী শুনতে শুনতে কখন ছোট্ট বিলের মনে বপন হয়ে যায় সম্প্রীতির বীজ, সকলের উর্দ্ধে জায়গা করে নেয় মানুষ। জীবনের সার হিসেবে দুটি জিনিসের উপর গুরুত্ব দেন (ক) মানবতা (খ) একাগ্র নিষ্ঠা।

এ্যাটর্নি বিত্তশালী পিতা বিশ্বনাথ বীরেশ্বরের জন্য গুরুমশায় ও পাঠশালার ব্যবস্থা নিজের বাড়িতে করেন। গুরুমশায়কে সাবধান করে দেন, পড়ুয়াদের উপর কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়া চলবে না, তাদের মন বুঝে কাজ করতে হবে। বিকেলের পাঠ শেষ হলে মা সরস্বতীর বন্দনা করতেন, মকর সংক্রান্তির দিন সব ছেলেরা গঙ্গায় গিয়ে পূজা দিত। দত্তবাড়ি থেকে শোভাযাত্রা বেরিয়ে গঙ্গার দিকে যেত, বীরেশ্বর নিজের হাতে সকলকে নতুন জামা কাপড় দিতেন। গলায় গাঁদা ফুলের মালা ঝুলিয়ে সারিবদ্ধভাবে সমবেত কণ্ঠে গাইতেন 'বন্দে মাতা সুরধনী/ পুরাণে মহিমা শুনি।'

সকলে বাড়ি ফিরে এলে বিশ্বনাথবাবু মিষ্টি দিতেন সকলকে বীরেশ্বরের জন্মদিন উপলক্ষে। সকলের সাথে মিলে মিশে থাকার শিক্ষা এভাবেই লাভ করেছিলেন বিবেকানন্দ।

সন্তানের জীবনে পিতার শিক্ষা, আদর্শের একটা বড় প্রভাব পড়ে। পিতা বিশ্বনাথের মধ্যে কোনো গোঁড়ামি ছিল না। তিনি একাধারে পড়তেন লিখতেন - গাইতেন আঁকতেন, রাঁধতেন, খেতেন খাওয়াতেন, উপার্জন করতেন এবং মুক্ত হস্তে দান করতেন । এক কথায় যাকে বলে A complete man, Kahlil Gibran এর *'The prophet'* তাঁকে খুব মুগ্ধ করেছিল। সন্তান পালনের ক্ষেত্রে তিনিও মেনে চলেছেন Gibran নির্দেশিত পথটি –

Your children are not your children তোমার সন্তান তোমার নয়।

They are the sons and daughters of life's longing for itself.

-এরা সব জীবনের অঙ্কুর, জীবনেরই জীবন আকাঙ্খা।

They come through you but not from you
তোমার মাধ্যমে এসেছে মাত্র, তোমার থেকে আসেনি।

And though they are with you yet they belong not to you তোমার সঙ্গে আছে বটে তোমার সম্পত্তি নয় কিন্তু।

You may give them your love but not your thouhts ভালবাসা দিতে পার, কিন্তু তোমার চিন্তা নয়। *For they have their own throughts* কারণ চিন্তা তার নিজস্ব।'

বিবেকানন্দের জীবনের অসংখ্য ঘটনায় এই কথাগুলি প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে লক্ষ্য করা গেছে। প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করতে হয় যেমন -

বারাণসীর রাস্তায় আচার্য শঙ্কর শিষ্যদের নিয়ে মণিকর্ণিকায় স্নান করতে যাচ্ছেন। জোরে উচ্চারণ করছেন, 'ওহে ওহে দাঁড়াও দাঁড়াও, দূরে যাও দূরে যাও, তখন আচার্য শঙ্করকে চমকে দিয়ে শিবরূপী চণ্ডাল বিশুদ্ধ সংস্কৃতে বলেছিলেন

'আপনি কাকে সরে যেতে বলছেন? আত্মাকে, কি এই দেহকে? আচার্য শঙ্কর, আত্মা তো সর্বব্যাপী, নিষ্ক্রিয়, সতত শুদ্ধ।'

এই কাহিনী বিবেকানন্দকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল বলেই শিবজ্ঞানে জীবসেবার মন্ত্র দিয়েছেন।

অমৃত কথার অনুশীলন চলছে বিবেকানন্দের, জোরে উচ্চারণ করে পড়ছেন -

"চারি জাত মিলে হরি ভজিয়ে, এক বরণ হো যায় (জ্যায়সা)/ অষ্ট ধাতুকে পরশ লাগায়ে, এক মূলকে বিকায়।।"

অর্থাৎ চার জাত একসঙ্গে যদি ঈশ্বরের আরাধানা করে তাহলে চতুবর্ণ এক বর্ণ হয়ে যায় - যেমন অষ্ট ধাতু পরশমণির ছোঁয়ায় সোনা হয়। কথা শোনা মাত্রই বিবেকানন্দ হাতে নাতে পরীক্ষার জন্য পিতার বৈঠকখানায় গেলেন। দেওয়ালে সার দিয়ে হুঁকো সাজানো। কোনোটা ব্রাহ্মণের, কোনোটা কায়স্থের, কোনটা শূদ্রের, কোনটা মুসলমানের। বীরেশ্বর সব হুঁকো টেনে দেখলেন জাত যায় কিনা। এছাড়া সকলের ছোঁয়ায় তিনি এক হয়ে উঠতে পারবেন, যাঁর এমন ভাবনা তিনি আমাদের গড়পড়তা চেনা গণ্ডীর অনেক উর্দ্ধে। সাম্য ও সৌসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য সারা জীবন অনুশীলন করেছেন মনুষ্যত্বের ।

সিস্টার ক্রিস্টিনের চিঠি থেকে জানা যায় -

'বিবেকানন্দ যে মুসলমান সংস্কৃতিকে এতো বুঝতেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ কোনও ব্যক্তি বা জাতির মহৎ গুণগুলি, শুধুমাত্র তার ইতিবাচক দিকগুলি, দেখবার এক বিরল ক্ষমতা তাঁর ছিল। ভারতবর্ষ বলতে তিনি কেবল হিন্দুদেরই বুঝতেন না, তাঁর মত ছিল সব নিয়েই ভারতবর্ষ। তিনি কথায় কথায়

প্রায়ই বলতেন আমার মুসলমান ভাই। বাস্তবিক ইসলামিক কৃষ্টি ,নিজের ধর্মের প্রতি মুসলমানদের নিষ্ঠা তাঁদের সাহসিকতা ইত্যাদি সদ্‌গুণের খুব প্রশংসা করতেন স্বামিজী।

এই কারণেই শিক্ষার সঙ্গে নিয়ম নিষ্ঠা সাহসিকতা ও শরীরচর্চাকে যুক্ত করেছেন। নামাজের মধ্যে শুধু ঈশ্বর আরাধনা নেই আছে যোগাসন। বেলুড় মঠে শিক্ষার ওতপ্রোত অঙ্গ হিসাবে যোগ করেছিলেন এগুলি। হিন্দু মুসলমানের মিশ্র সংস্কৃতির একজন প্রবক্তা ছিলেন বিবেকানন্দ। তাঁর চিঠি থেকে জানা যায়-

'Without the help of practical Islam theories of Vedantism, however fine and wonderful they may be, are entirly valueless to the vast mankind ..... for our motherland a junction of the two great systems, Hinduism and Islam Vedantic brain and Islamic body is the only hope.'[৪]

অর্থাৎ সমস্ত কিছুর মধ্যেও তিনি ভালো মন্দ দুটোই অনুসন্ধান করেছেন। মানুষের উদ্দেশ্য বলেছেন যে তাঁরা যেন বিচার বিবেচনার দ্বারা মন্দটা ত্যাগ করে ভালোর সমন্বয় করেন। আমাদের জীবনে তত্ত্বের যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন সেই তত্ত্বের প্রয়োগ বা বাস্তবায়ন। বেদান্তের কৌশল এবং ইসলামের কাছে টানার আবেগ মানুষের জীবনে খুবই প্রয়োজন।এই কারণে বিবেকানন্দ সব ধর্ম ও তার ক্রিয়া থেকে ইতিবাচক দিকগুলি গ্রহণ করে মহান ভারতবর্ষ গড়তে চেয়েছেন। মানুষ ও মানুষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী হয়েছেন। নর নারীর মধ্যে ভেদাভেদ গড়ে তুলে এক শ্রেণীর মানুষ যখন মুনাফা লাভ করছে বা নিজস্ব স্বার্থ চরিতার্থ করছে তখন স্বামীজি উচ্চরণ করলেন -

এদেশে পুরুষ মেয়েতে এতটা তফাৎ কেন যে করেছে তা বোঝা কঠিন। বেদান্তশাস্ত্রে তো বলেছে, একই চিত্তসত্তা সর্বভূতে বিরাজ করছেন। এসব আদর্শস্থানীয়া মেয়েদের যখন আধ্যাত্মজ্ঞানে অধিকার ছিল, তখন মেয়েদের সে অধিকার এখনই বা থাকবে না কেন? মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে।যে দেশে যে জাতে মেয়েদের পূজা নেই - সে দেশ, সে জাত কখনো বড় হতে পারেনি।' বিবেকানন্দ আজীবন নারীকে সম্মান করেছেন। মায়ের প্রতি বোনের প্রতি এমন কী সম্পর্কহীন যে কোনো নারীর প্রতি তাঁর সম্ভ্রমবোধ ছিল। বিবেকানন্দের পিতা মারা যাবার পর কপর্দক শূন্য অবস্থায় নাবালক সন্তানদের নিয়ে যখন দিশেহারা তখন বিবেকানন্দ তাদের আশ্বস্ত করেন। জীবনের শেষপর্যায় পর্যন্ত নারী সমাজের প্রতি কঠিন দায়িত্ব পালন করেছেন। মৃত্যুর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে গুরুভাইকে অনুরোধ করে বলেছিলেন -

'রাখাল , আমার শরীর ভাল নয়। আমি শিগগির দেহত্যাগ করবো, তুই আমার মার ও বাড়ীর বন্দোবস্ত করে দিস, তাঁকে তীর্থ দর্শন করাস, তোর উপর এইটি ভার রইল।

মেয়েদের দেখিয়ে স্বামীজি বলতেন -

'এঁরা মূর্তিমতী শক্তি। পাঁচশ পুরুষের সাহায্যে ভারতবর্ষ জয় করতে পঞ্চাশ বছর লাগতে পারে, কিন্তু পাঁচশ নারীর দ্বারা মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তা সম্ভব।'

কারণ তিনি জানতেন নারীর মধ্যে রয়েছে ধারণশক্তির ক্ষমতা। তাই তাকে উচ্চ স্থান দিয়েই পুরুষের যাত্রাপথকে প্রশস্ত করতে চেয়েছেন। যথার্থ সৃষ্টি পুরুষ ও নারীর সুস্থ মিলনেই সম্ভব। গার্হস্থ্য জীবন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনেও এই সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তাকে শুধু অনুভবই করেননি প্রয়োগের মাধ্যমে তাকে যথার্থতা দিয়েছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নারীরা ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলেছিল অধিকারবোধ ও বাঁচার সম্ভাবনাকে। এই ব্যবস্থাই বিবেকানন্দের চোখে বড় পাপ বলে মনে হলো। জাতপাত, বর্ণ-সম্প্রদায় আচার-বিচারের মধ্যে পাপ নেই, পাপ আছে মানুষকে অবমাননার মধ্যে, নারীকে দলিত করার মধ্যে।

অপাঙক্তেয়, দলিত, পতিত মানুষই তাঁর অন্তরাত্মায় জায়গা করে নিল। জাতি জাতি করে করে গরীব মানুষকে পিষে ফেলাই চূড়ান্ত অধর্ম। এই ভেদাভেদ সম্পর্কে বিবেকানন্দের দুটি মতামত আমরা তুলে ধরব -

"আদান-প্রদান জগতের নিয়ম। ভারতবর্ষ যদি আবার উঠিতে চায়, তাহা হইলে তাহার গুপ্তভাণ্ডারে যাহা সঞ্চিত আছে, তাহা বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিতরণ করিতে হইবে এবং বিনিময়ে অন্যে যাহা দিবে তাহা গ্রহণ করিবার জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সম্প্রসারণ'ই জীবন, সঙ্কোচই মৃত্যু, প্রেমই জীবন, ঘৃণাই মৃত্যু।"

পাশ্চত্য মানুষ সম্পর্কে বলেছেন -

'হিন্দুগণ তোমাদিগকে পাপী বলিতে অস্বীকার করেন। পাপী তোমরা অমৃতের সন্তান এই পৃথিবীতে পাপ বলিয়া কিছু নাই, যদি থাকে তবে মানুষকে পাপী বলাই এক ঘোরতর পাপ। তুমি সর্ব শক্তিমান আত্মা শুদ্ধ মুক্ত মহান ! ওঠো জাগো স্বস্বরূপ বিকাশ করিতে চেষ্টা কর'।

প্রাচ্য -পাশ্চাত্য , এদেশ-বিদেশ সর্বত্রই তিনি অন্বেষণ করেছেন মানুষকে। এই কারণে প্রাচ্যের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা তুলে ধরতে যেমন কুণ্ঠা বোধ করেননি, তেমনি

পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ বস্তুকেও নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মধ্যে সমন্বয় সাধনে বিবেকানন্দ বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি কখনও হিন্দু বা বৌদ্ধ হতে বলেননি খ্রীষ্টানকে,হিন্দু বা বৌদ্ধ কে হতে বলেননি খ্রীষ্টান বা মুসুলমান হতে বরং সকলকে নিজের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে পরস্পরের সঙ্গে সম্প্রীতির সেতু রচনায় অগ্রবর্তী হতে বলেছেন। প্রত্যেকের মধ্যেই শক্তি আছে সেই শক্তির কল্যাণময় প্রকাশ প্রয়োজন। আধ্যাত্মিক পবিত্রতা, দাক্ষিণ্য এগুলি কারওই একচেটিয়া বস্তু নয়। তাঁর বাণীই ছিল- ভেদদ্বন্দ্ব নহে, সামঞ্জস্য ও শান্তি। সর্ব ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় ও জাতির মধ্যে এক মহামিলনের যোগসূত্র গ্রন্থিত করতে চেয়েছেন। একক মানুষ নয়, সমষ্টি মানুষের উন্নয়ন, সমুন্নতি মৈত্রীর বন্ধনকে দৃঢ় করার চেষ্টা করেছেন। তিনি সংস্কারপন্থী ছিলেন না বরং স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। এই কারণে একেবারে শিকড় থেকে বা নীচে থেকে ক্রমশঃ উপরে সভ্যতাকে মেলে ধরার কাজ করেছেন। নিম্নস্তরের মানুষগুলিই সেই শিকড়, সেখানে জাত বর্ণ প্রধান নয়। চণ্ডালকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নয়নই যথার্থ উন্নয়ন। জন্মগতভাবে কেউ ব্রাহ্মণও নয়, চণ্ডালও নয়, কাজের দ্বারাই এই বিভাজন হয়। সম্প্রীতির সেতুটিকে শক্তভাবে বাঁধার জন্য শিক্ষাব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা, মানসিক উন্নয়ন, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য, নর-নারী, হিন্দু-মুসুলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান সকলের মিলন চেয়েছেন। যে মিলন এক নতুন ভারত গঠনের সহায়ক হবে।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ-

১) বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী

২) বিবেকানন্দ চরিত -- শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

৩) স্বামী বিবেকানন্দ ঃ এক অনন্ত জীবনের জীবনী - সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

৪) নানা বিবেকানন্দ ঃ কোরক সংকলন - সম্পাদনা তাপস ভৌমিক

৫) যুগ নায়ক বিবেকানন্দ-- সম্পাদনা ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়।

উল্লেখপঞ্জী -

১) যুগ নায়ক বিবেকানন্দ-- সম্পাদনা ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, পৃ.-৪১

২) স্বামী বিবেকানন্দ ঃ এক অনন্ত জীবনের জীবনী সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, পৃ.-২০৪-২০৫

৩) নানা বিবেকানন্দ ঃ তাপস ভৌমিক সম্পাদিত, পৃ.-২৫৩

৪) যুগ নায়ক বিবেকানন্দ-- ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, পৃ.-৪০

৫) বিবেকানন্দ চরিত -- শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, পৃ.-১৩৮

৬) বিবেকানন্দের বাণী, তৃতীয়খণ্ড, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য, পৃ.-১৫৮

আমন্ত্রিত রচনা

ঈশ্বর ভাবনা ও স্বামী বিবেকানন্দ

শুভময় পাহাড়ী
শ্রী জগন্নাথ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়
পুরী, ওড়িশা

ভারতবর্ষের জনসমুদায়ের সামাজিক, ধার্মিক এবং আর্থিক পরিস্থিতিকে যিনি নিকট থেকে দেখেছিলেন, বুঝেছিলেন এবং পরবর্তী কালে তা থেকে যাঁর দার্শনিক চিন্তার উদ্ভব, তিনিই হলেন কলকাতার শিমুলিয়ার বিখ্যাত দত্ত বংশের পুত্র তথা বিশ্বনাথ দত্ত এবং ভুবনেশ্বরীদেবীর সুযোগ্য সন্তান, শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সুযোগ্য শিষ্য নরেন্দ্র নাথ দত্ত। পরবর্তী সময় যিনি স্বামী বিবেকানন্দ আখ্যায় ভূষিত। তথা কথিত সমাজের অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার প্রভৃতির বিরুদ্ধে তিনি মস্তক উত্থাপন করে ভারতবাসী তথা বিশ্বের দরবারে প্রকৃত সত্তা, সত্য বস্তু বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চারের জন্য প্রবৃত্ত হন। সেই সত্যটি হল আধ্যাত্মিকতা। তাই তিনি বিভিন্ন ধর্মে নিহিত আধ্যাত্মিকতাকে জানতে এবং বুঝতে চেয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় দর্শন তাঁর অনুসন্ধানে মাধ্যম রূপে গৃহীত ছিল, বিশেষতঃ বেদান্ত দর্শন। এছাড়াও যোগ দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন ও তাঁর কাছে ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ধর্মীয় ক্ষেত্রে তিনি মানুষের চারিত্রিক বলকে বিশেষ মহত্ত্ব প্রদান করেন। বিবেকানন্দ ঈসাই শিক্ষা থেকে সেবা ও প্রেম বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাই তাঁর কণ্ঠে উদ্‌ঘোষিত "জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" অর্থাৎ তাঁর মতে জীব সেবাই শিব সেবা - প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব লক্ষণীয়। বিবেকানন্দের এই রূপ আধ্যাত্মিক জাগরণের যিনি মূল তিনি হলেন শ্রী রামকৃষ্ণ। তাই স্বামী নিখিলানন্দ বলেছেন - "It was his master who had taught him the divinity of the soul, the non-duality of god head, the unity of existence, harmony of all different religions"

দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে বিবেকানন্দের দর্শন অধ্যাত্ম দর্শন (idealism) রূপে গ্রহণীয়। ইংরেজিতে 'idealism' শব্দের বিশ্লেষণ করলে তার তিনটি অর্থ পাওয়া যায়, যথা - ideal+ism,' "Idealism' "Idea+ism' ।প্রথমটির অর্থ আদর্শবাদ, দ্বিতীয়টি অধ্যাত্ম্যবাদ এবং অন্তিম শব্দের অর্থ প্রত্যয়বাদ। তত্ত্ব মীমাংসা - জ্ঞানমীমাংসা দৃষ্টিতে তাঁর দর্শন তত্ত্ব মীমাংসীয়। যাই হোক বিবেকানন্দের অধ্যাত্ম্যবাদ একত্ববাদী - অর্থাৎ সৎ বস্তু অনির্বচনীয়। কিন্তু কখনো কখনো তাঁর চিন্তনে ঈশ্বরবাদী (Monotheistic) বিবরণ স্পষ্ট হয়ে উঠে। তাই সাধারণতঃ পাঠক মনে সংশয় দেখা

যায় যে তাঁর দর্শন একত্ববাদী অথবা ঈশ্বরবাদী ? কিন্তু এই রূপ সংশয় বিবেকানন্দের মনে কোনো প্রভাব ফেলেনি কারণ এই দ্বিবিধ সিদ্ধান্তের কোনো মৌলিক পার্থক্য দেখা যায় না। কেন না ঈশ্বর তত্ত্ব সৎ বস্তুর আলোচনা নয়, সৎ বস্তুর জ্ঞানের জন্য এক মাধ্যম স্বরূপ। তাই বিবেকানন্দের চিন্তাতে ঈশ্বর তত্ত্ব বিশেষ আলোকপাত করে। তাঁর দর্শনে 'অমূর্ত একবাদ' এবং 'ঈশ্বরবাদ' - এর মিশ্রণ দেখা যায়, তাই তিনি সর্বেশ্বরবাদী (pantheist) ! তাঁর চিন্তনে আবার ঈশ্বর হলেন ব্যক্তিত্ব পূর্ণ সত্তা। তাই তাঁর দর্শনে মুখ্যত দুটি বৈচারিক ধারা প্রবাহিত - প্রথমটি অদ্বৈত বেদান্তের এবং দ্বিতীয়টি ভক্তিদর্শনের ঈশ্বর বিচারকে বিশ্লেষণ করে। অর্থাৎ এই দুটি ধারা মূলত একই সৎ বস্তুর দুটি দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু সৎ বস্তুর বিভাজন কখনোই সম্ভব নয়। তাই তিনি বলেছেন - "The infinite is indivisble, there can not be parts of the infinite, The Absolute can not be devided."[২] কিন্তু তাঁর বিচারকে জানতে হলে তত্র নিহিত দুটি পক্ষের বিশিষ্টতা স্পষ্ট রূপে জানা দরকার।

সৎ বস্তুর স্বরূপ প্রসঙ্গে তিনি অদ্বৈতবেদান্তের অনুরূপ মত পোষণ করেন। তাঁর মতে সৎ হল এক নিরপেক্ষ ব্রহ্ম। তা যদ্যপি এক কিন্তু সম্পূর্ণ (whole) বলা যুক্তি যুক্ত নয়। কারণ সম্পূর্ণ শব্দের অর্থ অবয়ব যুক্ত অর্থাৎ যার অংশ আছে। আর অবয়বের মিলিত রূপ হল অবয়বী বা অংশী, যেখানে অংশাংশী সম্বন্ধ লক্ষ্য করা যায়। তাই সৎ যদি সর্বব্যাপক হয় তাহলে সৎ ও অবয়বী হয়ে যায়, এবং সৎ বস্তুরও অংশ কল্পনা করতে হয়। তাঁর মতে অসীম অর্থাৎ সৎ অবিভাজ্য। তার অবয়ব বা অংশ অসম্ভব। তাই সৎ বস্তুতে সম্পূর্ণতা এবং অবয়বের বিচার নিরর্থক। অমূর্ত বিচার প্রক্রিয়ার অন্তিম সীমা হল সৎ বস্তুর জ্ঞান, সেই সৎ-ই বেদান্তের ব্রহ্ম বা আত্মা - তা এক এবং অদ্বৈত।

বিবেকানন্দের মতে এই সৎ বা ব্রহ্ম দেশ -কাল-উৎপত্তি প্রভৃতির অতীত, তাই তা অপরিবর্তনশীল। অর্থাৎ ত্রিকালবাধরাহিত্যম। তাঁর মতে সৎ হল অনির্বচনীয়। যদিও ঈশ্বর ব্রহ্মের মধ্যে অভেদ লক্ষণীয়, তথাপি সাধারণ মানুষের নিকট এই অভেদ অনুমান গম্য নয়। প্রধানত বিবেকানন্দ ঈশ্বর, আত্মা, জগৎ প্রভৃতিকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে স্বীকার করেন না। এর দ্বারা তিনি কেবল একে অপরের সঙ্গে সম্বন্ধ করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে - "God is neither outside nature nor inside nature, but God and nature and soul and universe are all convertible terms. you never see two things. It is your metaphorical words that delude you"[৩] কিন্তু নিরপেক্ষ সৎ সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞেয়, তাঁর ভেদও অসম্ভব। তাই সে বিষয়ে কোন বিচারই সম্পূর্ণ নয়। তথাপি যথা সম্ভব তার পারিপার্শ্বিক বিচারের দ্বারা তিনি সৎ বা ব্রহ্মকে 'সচ্চিদানন্দ' বলে প্রতিপন্ন করেছেন। সৎ অর্থাৎ 'Existence', চিৎ অর্থাৎ

'Consciousness' এবং আনন্দ শব্দের অর্থ হল 'Bliss' - এই আনন্দের মূল হল প্রেম (Love)। এই প্রেমই হল বিবেকানন্দের ঈশ্বর বিচারের মূল পক্ষ। তাই সৎ বিচারের মধ্যে ঈশ্বর বিষয়ক আলোচনাও বর্ণিত।

দার্শনিক দৃষ্টিতে যদিও এই রূপ বিচার দোষপূর্ণ তথাপি বিবেকানন্দ এইরূপ দার্শনিক সমস্যার সমাধান স্বকীয় রীতিতে করার প্রয়াসী হয়েছেন, যেমন আচার্য শংকর ব্রহ্মের আলোচনায় ব্রহ্মকে পারমার্থিক সত্তা প্রদান করে ঈশ্বরকে ব্যবহারিক সত্তা রূপে প্রতিপাদন করেন। তাঁর মতেও ঈশ্বর মায়া অবিদ্যার দ্বারা যুক্ত। তাঁর দৃষ্টিতে ব্রহ্ম ও ঈশ্বর দ্বিবিধ সত্তা নয়। সৎ হল অস্তিত্ব যুক্ত। প্রাথমিক রূপে সৎ জ্ঞান অসম্ভব তাই এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টির দ্বারা বিচার করেছেন। এই সৎকে যখন এক দৃষ্টিতে দেখা হয় তখন তা ব্রহ্ম আর যখন পরিবর্তিত দৃষ্টিতে দেখা হয় তখন তা ঈশ্বর রূপে প্রতীত হয়। তাই তাঁর মতে এই ভেদ সৎ - এর নয় তা হল দৃষ্টির ভেদ অর্থাৎ তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে সৎ ব্রহ্ম এবং ধার্মিক দৃষ্টিতে সৎ হল ঈশ্বর।

বিবেকানন্দের মতে ঈশ্বর সর্বব্যাপক। তাঁর মতে - 'Through his control the sky expands, through his control the air breathes, through his control the sun shines and through his control all live. He is the Reality in nature, He is the soul of your soul"[4] তাঁর মতে ঈশ্বর অবশ্যই আছেন এবং তা ধ্রুব সত্য। তিনিই আমাদের জীবনের নিয়ামক। তাই বিবেকানন্দের কণ্ঠে উদ্ঘোষিত - "দর্শন শাস্ত্র ও তত্ত্ববিদ্যা যত উচ্চ আসনই গ্রহণ করুক, যতদিন জগতে মৃত্যু ব্যাপারটি থাকিবে ততদিন মানব হৃদয়ে দুর্বলতা বলিয়া কিছু থাকিবে, যতদিন চরম দুর্বলতায় মানুষের মর্মস্থল হইতে রোদন ধ্বনি উত্থিত হইবে, ততদিন ঈশ্বর বিশ্বাস ও থাকিবে।" কিন্তু নিরপেক্ষ সৎ বিষয়ে বলেন - " ..... the Absolute is that ocean, while you and I, and sun and star and everything else are various waves of that ocean. And what makes the waves different ? Only the form, and that form is Time, Space and Causation all entirely dependent on the wave."[5] যাই হোক বিবেকানন্দের ঈশ্বর বিষয়ক দৃঢ় আস্থা অনস্বীকার্য। তাঁর মতে ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস ছাড়া কোন কিছু অসম্ভব। ঈশ্বর হলেন জীব জগতের আধার স্বরূপ। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়েও ধার্মিক সম্প্রদায় বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করেন।

তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভূতি সম্ভব তাই তাঁর অস্তিত্ব সিদ্ধির জন্য যুক্তি-তর্ক বৌদ্ধিক নির্দেশ অনাবশ্যক। যেখানে সাক্ষাৎ প্রতীতি অসম্ভব সেখানেই যুক্তি-তর্ক বৌদ্ধিক নির্দেশ প্রয়োজন। তাহলে কি যে যখন যে অবস্থায়

চাইবে ঈশ্বর অনুভূতি প্রাপ্ত হবে? না, তার জন্য বছর বছর কঠিন সাধনা এবং আত্মঅনুশাসন এবং চিন্তন আবশ্যক। যদিও বিশেষ দৃষ্টিতে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার সম্ভব তথাপি সাধারণ দৃষ্টিতে তা রহস্যাত্মক। তাই সাধারণের অববোধের জন্য এই অনুভূতির যথার্থতা এবং প্রামাণ্যতা বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে অন্বেষণ যোগ্য। তাই ঈশ্বর স্বরূপ জানার জন্য বৌদ্ধিক স্বরূপ অর্থাৎ প্রমাণাদিও আবশ্যক। তাহলে বৌদ্ধিকভাবে কেমন করে সাক্ষাৎকার সম্ভব? তাঁর মতে প্রমাণের উল্লেখ সাধারণত ধর্মদর্শনে উপলব্ধ।

সাধারণত ঈশ্বর অস্তিত্ব স্থাপনের জন্য বিবেকানন্দ দু-প্রকার প্রমাণ উপস্থাপন করেন - ১। প্রাগনুভাবিক (a priori) এবং ২। অনুভাবাশ্রিত (aposteriori)। ঈশ্বরের অস্তিত্বের সাক্ষ্য এবং তাঁর কার্যফল সমন্বয়ের দ্বারা এবং তার আধার স্বরূপ ঈশ্বরাস্তিত্বের সিদ্ধিই অনুভবাশ্রিত। তার বিপরীত অর্থাৎ সাক্ষ্যের অভাবেও কেবল ঈশ্বর ভাবনার বিশ্লেষণের আধারেও ঈশ্বরাস্তিত্ব সিদ্ধি সম্ভব। তা হল প্রাগনুভবিক প্রমাণ। এদের একত্রও সম্ভব। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর যুক্তি পারস্পরিক প্রয়োজনাত্মক প্রমাণ (teleological proof for Gods existence) রূপে প্রতীত হয়। বাহ্য জগতের সম্পূর্ণতা, ব্যবস্থা, সামঞ্জস্য, বিশালতা প্রভৃতি দেখার পর অনুভূতি হয় যে এদের কারণ এইরূপ ব্যক্তি ঈশ্বর। তাই বিবেকানন্দ বলেন - "The whole of nature at best could teach them only of a personal being who is the ruler of the universe, it could teach nothing further. In short, out of the external world, we can only get the idea of an architect, that which is called design theory."[6] তাঁর মতে জগতের বিশ্লেষণ ছাড়া সর্বশক্তিমান কারণকে স্বীকার অসম্ভব। এইরূপে জগতে উৎপত্তি গতি-বিকাশ অযোগ্য বহু পদার্থ লক্ষ্য করা যায় যাদের উৎপত্তি কর্তারূপে ঈশ্বরকে গ্রহণ করা হয়। যথা - বৃষ্টিপাত, সূর্যালোকাদি প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। তাঁর মতে জগতের বিভিন্ন বস্তু সমূহ পরস্পর ভিন্ন রূপে প্রতীত হলেও মূলত ঃ কিন্তু তা এক রূপ। যদি গভীরভাবে চিন্তা করা যায় তাহলে মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, উচ্চ নীচ বর্ণে, ধনী দরিদ্রতে, জীব ও মানবে, ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে একত্ব দেখা যায় এবং লক্ষ্য করা যায় যে সমস্ত বস্তু কোন একটি তত্ত্বের স্পন্দন স্বরূপ। তাই তাঁর মতে "If you go below the surface, you find that unity between man and man, between races and races, high and low, rich and poor, gods and men, and men and animals. If you go deep enough, all will be seen as only vibrations of the one, and who has attend to his conception of oneness has no more delusion.[7]

শব্দ প্রমাণের দ্বারাও তিনি ঈশ্বরাস্তিত্ব সিদ্ধি করেন। তাঁর মতে যতক্ষণ ঈশ্বরীয় জ্ঞান বা ঈশ্বরীয় অনুভূতি প্রাপ্ত না হয় ততক্ষণ-ই বেদ-উপনিষদ-ধর্মশাস্ত্রাদির সাহায্য আবশ্যক। আরও ঈশ্বর সিদ্ধির জন্য তিনি বিভিন্ন উপমার প্রতিপাদন করেছেন। যথা একটি অঙ্কিত সুন্দর চিত্রের সৌন্দর্যের আনন্দকে প্রাপ্ত হন - বিক্রেতা, দর্শক বা ক্রেতা, অথবা জ্ঞাতা। জ্ঞাতা চিত্রটিকে সুন্দরভাবে দেখে বুঝে আনন্দ পান। তাই এই বিশ্বও একটি চিত্র, প্রাণী এই বিশ্বের ক্রয়-বিক্রয়, লাভ-ক্ষতিতে ব্যস্ত সে এই আনন্দ পায় না। যখন আমরা এসবের উর্দ্ধে গিয়ে বিশ্বসৌন্দর্য দেখার প্রয়াসী হই তখনি বিশ্বসৌন্দর্যের আনন্দ বোধ সম্ভব। তাই তিনি বলেছেন -"So this whole universe is a picture, and when these drives have vainshed men will enjoy the world. "[৪] তিনি হলেন ঈশ্বর অস্তিত্ব কল্পনার এক কবি, কলাকার, চিত্রশিল্পী। - "I never read of any more beautiful conception of God than the following : He is the great poet, the ancient poet; the whole universe is his poem, coming in verses and rhymes and rhythms, written in infinite bliss. "[৯]

যাইহোক যদিও বিবেকানন্দ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদনের জন্য বহু প্রমাণের সংযোজন করেছেন, তবুও তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন 'অন্তঃপ্রজ্ঞামূলক প্রমাণে' (Intuitional proof) তাঁর মতে ঈশ্বর সিদ্ধি নিমিত্ত প্রমাণ প্রদর্শন যথার্থ নয়। কারণ সাক্ষাৎ প্রমাণের থেকে বড় প্রমাণ কিছু হয় না। তাই তিনি বলেন যে - কোন ব্যক্তি যদি চেষ্টা করেন, কঠোর সাধনা এবং ধ্যান মার্গ অবলম্বন করে চলেন তাহলে তাঁর ঈশ্বরানুভূতি অবশ্যই হতে পারে। সেখানে বৌদ্ধিক প্রমাণের কোন আবশ্যকতা থাকে না। তিনি মূলতঃ মানবের মধ্যে ঈশ্বরকে খুঁজেছিলেন, মানব ঈশ্বরের মধ্যে সম্বন্ধ প্রদর্শন করেছিলেন। তাই তাঁর কাছে ঈশ্বর মানবীয় ঈশ্বর। - "He has human attributes. He is merciful, He is just, He is powerful, He is almighty, He can be approached, He can be prayed to, He can be loved, He loves in return and so forth. In one word, He is a human God, only any language, all attempts of language, calling him father, or brother, or our dearest friend, are attempts to objectify God, Which can not be done. He is the eternal subject of everthing."[১১] এই রূপ উপযুক্ত উপায়ে বিবেকানন্দ অজ্ঞাত বিষয়কে জানার জন্য স্বল্প প্রয়াস অবলম্বন করেছিলেন।

পাদটীকা ঃ

(1) Swami Nikhilananda, Vivekananda, a Biography, P.53.
(2) Complete works, Vol. III, P.7
(3) "একমেবাদ্বিতীয়ম্"
(4) Complete works, Vol. III, P. 421.
(5) Ibid, Vol. II, P. 236.
(6) বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, পৃ, ৩১ (চিকাগো বক্তৃতা).
(7) Complete works, Vol. II, P. 135.
(8) Ibid, Vol. I, P.353.
(9) Swami Vivekananda, Jnana Yoga, P. 123. Ibid, Complete works Vol. III, P. 92.
(10) Swami Vivekananda, Jnana Yoga, P. 148.
(11) Ibid.
(12) Complete works, Vol.II, P. 40.

Part-II
(দ্বিতীয় পর্ব)

'অশনিসংকেত' ঃ প্রসঙ্গ সাময়িক পত্র

বাসন্তী ভট্টাচার্য
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

বাংলা সাময়িক পত্রের জন্ম হয়েছিল (১৮১৮) খবর পরিবেশনের প্রয়োজনে। জনসাধারণের কাছে সংবাদ বিতরণের তাগিদই ছিল প্রধান। সংবাদ বলতে প্রধানত বোঝাতো রাষ্ট্র শক্তির ঘোষণা, শাসক বর্গের বিবৃতি বা রাষ্ট্র সম্পর্কিত খবরাখবর। ক্রমশঃ সাময়িক পত্রের মাধ্যমেই দেশের নানা প্রান্তের নানা প্রকার সংবাদও ছড়িয়ে পড়তে লাগলো দেশের মানুষের মধ্যে। বলা যায় সমাজ ও রাষ্ট্রে সাময়িক পত্রের মাধ্যমেই নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল। কোন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল সন্দেহ নেই, ফলতঃ সাময়িক পত্রে দেশের মানুষের মতামতও প্রতিফলিত হত। অচিরেই মত প্রকাশের ক্ষেত্র হিসাবে সাময়িক পত্র গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। তখন শুধুই বার্তা পরিবেশন নয় প্রবন্ধ, উপন্যাস প্রভৃতিও সাময়িক পত্রের পাতায় আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করলো। শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাময়িক পত্র' (১৮১৮ - ১৮৬৮) গ্রন্থের নিবেদন অংশে বলছেন, 'বাংলা সাহিত্যের প্রসারের সহিত বাংলা সাময়িক পত্রের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, ১২২৫ (ইং ১৮১৮) সালে প্রথম সাময়িক পত্র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে।' সাময়িক পত্রের জন্ম-ইতিহাস, ক্রমবর্ধমান প্রসার, বিভিন্ন পত্রিকা-পৃষ্ঠায় মুদ্রিত সাহিত্য ও সাহিত্যিকের ইতিহাস গবেষক শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যকেই সত্য প্রমাণিত করে। সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠাতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছেন ভবিষ্যতের কোন সম্ভাবনাময় সাহিত্যকার এমন উদাহরণ তো সুপ্রচুর। এমন কি নির্দিষ্ট কোন সাময়িক পত্রের সম্পাদকের হাতে তৈরি হয়ে উঠেছেন ভাবীকালের কবি সাহিত্যিক এমন দৃষ্টান্তও দেখি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত থেকে শুরু করে সাগরময় ঘোষ প্রমুখ পর্যন্ত। অর্থাৎ সাময়িক পত্র ও সাহিত্যের যোগ অতি নিবিড়।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক। বিভূতিভূষণ বিশিষ্ট তাঁর সাহিত্য রচনার বিশেষ আঙ্গিকে। সাধারণত প্রকৃতির সৌন্দর্য, প্রকৃতির কোলে বাস করা সহজ জীবনধারার মানুষজন তাঁর রচনার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে। এমনকি প্রকৃতির রূপলোক থেকে এক অসীম মিস্টিক অধ্যাত্মলোকে বিচরণ করাও ছিল বিভূতিভূষণের নিজস্ব ভঙ্গি। তাঁর রচিত উপন্যাস ও চরিত্রাবলীর দিকে তাকালেই বোঝা যায়, তারা এক গভীর জীবনবোধ বহন করে যে বোধ সর্বদাই

আশায় উদ্দীপ্ত। তাঁর রচনায় যে জীবনের কথা আসে সে জীবন এক ব্যাক্তিতেই শেষ হয়ে যায় না। জীবনের একটা পরম্পরা ও এই পরম্পরার প্রতি বিশ্বাস বিভূতিভূষণের রচনার আইডেনটিটি। তাই তাঁর এক উপন্যাস প্রবাহিত হয় আর এক উপন্যাসে। তৈরি হয় 'পথের পাঁচালি' (১৯২৯) ও 'অপরাজিত' (১৯৩২) দুই খণ্ডে বিধৃত অপুর জীবন কাহিনী। যে কাহিনীর মূল সুর পরম্পরা। অপুর জন্মলগ্নেই চিহ্নিত হয়ে যায় ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যুর পটভূমিকা। দিদি দুর্গার মৃত্যুকে অতিক্রম করে অপূর্ব পা বাড়ায় নতুন জীবনের দিকে। যে জীবনে অপর্ণা আসে, অপর্ণার মৃত্যু আসে। কিন্তু সে মৃত্যুর প্রলম্বিত ছায়াকে মুছে দিয়ে আসে কাজল। এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে বয়ে চলা জীবনের ধারা পাঠকের মনে এই প্রতীতি জন্মায় যে এই জড়প্রিয়, যান্ত্রিক, তুচ্ছ খণ্ডবুদ্ধির অসম্পূর্ণতা থেকে জীবন আসলে অনেক অনেক বড়। জীবনের এই পূর্ণরূপ অঙ্কনের চেষ্টাতেই মনে হয় বিভূতিভূষণ ঠিক কল্লোলগোষ্ঠীর লেখক নন। মানসিকতার দিক থেকে ইনি এক স্বতন্ত্র জগতের অধিবাসী। গোপাল হালদার কে এক চিঠিতে লবন সত্যাগ্রহ (১৯৩০) সম্পর্কে লিখেছিলেন ঃ 'ওসব আমাদের কিছু নয়, আমরা সাহিত্যিক, আমরা জীবনের অনেক গভীরতর দেশকে দেখি।' এই বিভূতিভূষণই চোখ ফেরাতে বাধ্য হয়েছিলেন সমকালের দিকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ১৯৪৩ সালে (বাংলা ১৩৫০) বাংলায় যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তার থেকে চোখ সরাতে পারেননি বিভূতিভূষণ। বলা যায় তৎকালীন সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলিতে দুর্ভিক্ষ ও তদ্‌জনিত যে ক্ষয় ক্ষতির তথ্য পরিবেশিত হয় তার থেকে চোখ ফেরানো অসম্ভব ছিল। বিভূতিভূষণের 'অশনিসংকেত' ৫০ এর মন্বন্তরের তথ্যভিত্তিক উপন্যাস। দুর্ভিক্ষের বছরেই 'মাতৃভূমি' নামক পত্রিকায় মাঘ মাস থেকে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে। দু বছর পরে ১৩৫২ সালের মাঘ পর্যন্ত পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় এবং তারপরে বন্ধ হয়ে যায়। 'অশনিসংকেত' উপন্যাসটিও অসমাপ্ত হয়ে পড়ে থাকে। অবশেষে ১৯৫৯ সালে বিভূতি প্রকাশন থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে 'অশনিসংকেত'। বিভূতিভূষণের নায়ক অপুর স্বপ্নের গ্রাম বাংলায় ক্ষুধার যে কান্না উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল, মৃত্যুর যে মিছিল চিহ্নিত হয়েছিল তারই সাহিত্যরূপ 'অশনিসংকেত'। ক্ষুধার সে অবহেলিত কান্নাকে কণ্ঠ দিয়েছিল তৎকালীন সাময়িক পত্রিকাগুলি। বিভূতিভূষণের অন্যান্য উপন্যাসগুলির মধ্যে একেবারে চলতি সাম্প্রতিক বর্তমান কাল এমন প্রত্যক্ষভাবে উঠে আসেনি যেভাবে 'অশনিসংকেত' উপন্যাসে ধরা পড়েছে। 'অশনিসংকেত' যেভাবে মৃত্যুদৃশ্য দিয়ে শেষ হয়েছে বিভূতিভূষণের অন্যান্য উপন্যাসে সে ধারা দেখা যায় না। উপন্যাসের সাথে মিলিয়ে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলি পর্যালোচনা করলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

উপন্যাসে দেখি গঙ্গাচরণ ও অনঙ্গ বৌ জ্ঞাতিশত্রুতার কারণে আদি নিবাস নদীয়া জেলার হরিহরপুর গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু জমি-জায়গা-স্বচ্ছলতা ও ব্রাহ্মণত্বের একাধিপত্যের সন্ধানে ভাতছালা, ভাতছালা থেকে বাসুদেবপুর আবার বাসুদেবপুর থেকে চরপোলতার নতুন গাঁয়ে এসে বাসা বেঁধেছে। বার বার তারা ঠাঁই বদলেছে নিজের ধানি জমির স্বচ্ছলতায় পূর্ণ সংসারের স্বপ্ন বুনেছে। অম্বিকাপুরের লোয়ার প্রাইমারী স্কুলের সেকেণ্ড পণ্ডিত দুর্গাপদ বাঁড়ুজ্যের কাছে যখন গঙ্গাচরণ প্রথম চালের দাম বাড়ার কথা শুনেছে তখন আশঙ্কা একটা দেখা দিয়েছে কিন্তু মনে মনে বিশ্বাস করেছে 'না খেয়ে মানুষ মরে না'। স্বামীর কাছে দাম বাড়ার কথা শুনে অনঙ্গ বৌও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেছে 'দূর! রেখে দাও ওদের সব গাঁজাখুরি কথা। চাল পাওয়া যাবেনা, নুন পাওয়া যাবেনা, তবে দুনিয়া পৃথিমে লোক বাঁচতে পারে কক্‌খনো?' কিন্তু মানুষের বিশ্বাসের জগৎ ক্রমশঃ ভেঙ্গে গেছে। জাপানী আক্রমণ, সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্ম দেশের পতন, সরকারী আনুকূল্যে শস্য সঞ্চয়ের ফলে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, একদল মানুষের অত্যধিক মুনাফাপ্রীতির ফলে বলা যায় মনুষ্যসৃষ্ট মহামন্বন্তরের ছবিই ফুটে উঠলো বিভূতিভূষণের 'অশনিসংকেত' উপন্যাসে।

উপন্যাসে বিভূতিভূষণ দেখিয়েছেন দুর্ভিক্ষ শুরু হবার আগে জিনিস পত্রের দাম হঠাৎ করে বাড়েনি, ধীরে ধীরে বেড়েছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে কোন কোন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ যেমন কেরোসিন, দেশলাই একেবারে উধাও হয়ে গেছে। বৈশাখের মাঝামাঝি থেকে কতকগুলি আশ্চর্য পরিবর্তন গঙ্গাচরণ লক্ষ্য করেছে বাজারে জিনিস কিনতে গিয়ে। ইয়াসিন বিশ্বাসের বড় গোলদারি দোকানে কেরোসিন চেয়ে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে গঙ্গাচরণ সহ আরো অনেককে। শুধু কেরোসিন নয় ইয়াসিন বুদ্ধি দিয়েছে নুন ও চালও কিনে রাখতে। ব্যবসাদারি বুদ্ধিতে ইয়াসিন এটুকু বুঝেছে বাজারে জিনিস উধাও হয়ে যাবার অদৃশ্য কারসাজি শুরু হয়ে গেছে। হিতাকাঙ্খীরূপে সে পণ্ডিত মশাই গঙ্গাচরণকে সাবধান করতে চেয়েছে। গঙ্গাচরণের জীবনে আজ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছে যা এর আগে কখনও হয়নি, 'পয়সা থাকলেও জিনিস মেলে না।'

১৩৪৯ শ্রাবণ সংখ্যায় 'প্রবাসী' জানাচ্ছে "দেশে শুধু যে চাল ও ময়দার দাম বেড়েছে তা নয়, নুন, চিনি, গুড় প্রভৃতির দামতো বেড়েইছে, সাধারণ শাক-সবজীর দামও খুব বেড়েছে।"

১৩৫০ আষাঢ় সংখ্যার 'ভারতবর্ষ' জানাচ্ছে "....বাজারে যে চাউল পাওয়া যাইতেছে না তাহা সকলেই জানেন। মধ্যে বাজারে কিছুটা আটা পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহা ধনিকগণ অধিক পরিমানে তাড়াতাড়ি ক্রয় করিয়া লওয়ায় মধ্যবিত্তগণ এখন আর বাজারে আটাও পাইতেছে না। এই ত গেল প্রধান খাদ্যের কথা। চিনি মধ্যে মধ্যে

কন্ট্রোল দরে অতি সামান্য পরিমানে পাওয়া গেলেও সর্বসাধারণের পক্ষে তাহা সুলভ বা সহজপ্রাপ্য নহে। কয়লার অভাবের কথা আমরা বহুবার আলোচনা করিয়াছি - কিন্তু এখনও বাজারে আড়াই টাকার কম মণ দরে কয়লা পাওয়া যায় না। কেরোসিন তৈল পাইতে মফঃস্বলের লোকদিগকে কিরূপ কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে বুঝিবে না।"

'মাসিক বসুমতি' ১৩৪৯ আষাঢ় সংখ্যায় 'খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি' শিরোনামে জানাচ্ছে "বাংলায় চাউলের মূল্য ক্রমশ অতিশয় হইতেছে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে সাধারণ মোটা চাউলের মণও আট টাকায় উঠিয়াছে।"

'দেশ' ১৩৪৯ সন ২২ ফাল্গুন সংখ্যায় জানাচ্ছে, "অন্নসমস্যা উত্তরোত্তর গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। ..... চাউলের মূল্য দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে, এক বৎসর পূর্বেও যে চাউল প্রতি মণ পাঁচ টাকায় মিলিত এখন তাহা পনেরো টাকায়ও মিলিতেছে না।"

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মন্বন্তর' উপন্যাসে আছে প্রধানত নগর কলকাতার যুদ্ধ-আতঙ্কিত ছবি। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকেও দেখি মহানগরের অর্থবান মানুষের অন্নের অপচয়ের পাশে নিরন্ন মানুষের অন্নের জন্য হাহাকার। বিভূতিভূষণের 'অশনিসংকেত'-এ গ্রামবাংলার মানুষের দুঃখদুর্দশার যথাযথ রূপ ফুটে উঠেছে। দুর্ভিক্ষ শুরু হওয়ায় গ্রামের মানুষ প্রথমে একবেলা উপবাস দিয়েছে, তারপর সন্তানের মুখে যৎসামান্য তুলে দিতে পেরে নিজে দুবেলা উপোস দিয়েছে, তারপর সেটুকুও যখন অমিল হয়েছে তখন পুকুর বিল থেকে গেঁড়ি-গুগলি তুলে খেয়েছে। তখন সে আর অন্নের কথা ভাবে না। দুটো কলমি শাক বা শুশনি শাক বা একটা কচু, বড় মেটে আলু পেলে নিজেদের ভাগ্যবান ভেবেছে। নিজের প্রতিবেশীর সাথে অদৃশ্য প্রতিযোগিতায় নেমেছে, সবার আগে খাদ্যসম্পদ নিজে যোগাড় করতে চেয়েছে। অন্নের অভাবে বিকৃত খাদ্যের ব্যবহারে শুরু হয়েছে মানুষের মৃত্যু।

ভারতবর্ষ ১৩৫০ আষাঢ় সংখ্যা জানাচ্ছে, "নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের এইরূপ দারুণ অভাবের ফলে লোকে একবেলা খাইয়া ও অনেক স্থলে না খাইয়া থাকিতে বাধ্য হয়- তাহাতে দেশে নানারূপ সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিয়েছে ও অকালে মানুষ মারা যাইতেছে।"

'উদ্বোধন' ১৩৫০ কার্তিক সংখ্যায় 'বাঙলায় অন্নসংকট' (সম্পাদকীয়) শিরোনামে জানাচ্ছেন, "মফঃস্বলের শহর ও পল্লীসমূহের অবস্থা আরও শোচনীয়। বাঙলা দেশে এখন এরূপ শহর বা পল্লী একটিও নাই যেখানকার অধিকাংশ লোক দুই বেলা খাইতে পাইতেছে। ভিক্ষার অভাবে উপবাস থাকিয়া এবং অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া

দলে দলে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে।"

১৩৫১ আষাঢ় সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয় ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের এক বিবৃতি "দুর্ভিক্ষের পর বাংলাদেশে সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ শুরু হইয়াছে। এমন একটি জেলাও নাই, যেখানে ইহা ভয়াবহ আকার ধারণ করে নাই। গবর্মেন্ট ও বাংলাদেশের অন্যূন পক্ষে ১৮টি জেলায় কলেরা ও বসন্ত সংক্রামক আকারে দেখা দিয়াছে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। বিভিন্ন স্থানে যাহারা সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাহাদের হিসাবে বাংলার অন্ততঃ দুই কোটি লোক আজ রোগগ্রস্ত।"

দুর্ভিক্ষ শুরু হওয়ায় অন্নহারা মানুষ ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। রাধিকানগরের বাজারে পাঁচু কুণ্ডুর চালের দোকান, বিশ্বাস মশাইয়ের গুদাম লুঠ হতে শুরু করে। গ্রামে যাদের হাতে জমির ধান ছিল তারা অল্প হাতে রেখে বাকি ধান বিক্রি করে দেয়। নতুন জামা জুতো কেনে, আমোদ করে। টাকা রেখে দেয় ভবিষ্যতে চাল কিনবে বলে। তখনও তাদের বিশ্বাস ছিল বেশি দাম দিলেই চাল মিলবে কিন্তু অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হওয়ায় তারাও বিপদে পড়ে। সরকার থেকে গুদামজাত চাল উদ্ধার করতে শুরু করে রেশনের মাধ্যমে বিতরণের ব্যবস্থা করবে বলে। ফলে যার কাছে যা চাল সঞ্চিত ছিল তাও রাতারাতি অদৃশ্য হয়ে যায়। এদিকে সরকার রেশন ব্যবস্থা চালু করলেও তা শহরেই সীমাবদ্ধ থাকে গ্রামের মানুষ সে সুবিধা থেকে বঞ্চিতই থাকে।

১৩৪৯ মাঘ সংখ্যায় 'প্রবাসী' জানাচ্ছে, "সংবাদপত্রের নিষ্পেষিত ক্ষীণ কণ্ঠ ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে চাউল ও বস্ত্র লুণ্ঠনের যে সব সংবাদ আসিতেছে তাহা বস্তুতই আশঙ্কার বিষয়। ..... চাউল ও বস্ত্র লুণ্ঠন এবং চুরি ডাকাতি বন্ধ করিবার জন্য সৈন্য পুলিশের উপর নির্ভর করা বৃথা। ইহার অর্থনৈতিক সমাধান করিতে না পারিলে কঠোর দণ্ড সত্ত্বেও এই সব চুরি ডাকাতি বন্ধ হইবে না এবং গ্রামাঞ্চলে শান্তি রক্ষা কঠিন হইয়া উঠিতে পারে।"

১৩৫০ সালের আশ্বিন সংখ্যায় 'প্রবাসী' জানাচ্ছে, "ধান ও চাউলের উর্ধতম মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে .....ধান ও চাউলের দর বাঁধিয়া না দিলে এবং অতিলোভী ব্যবসায়ীদের ধরিয়া কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত না করিলে অনশনক্লিষ্ট দুঃস্থ জনসাধারণের মুখের গ্রাস লইয়া যে লুট চলিয়াছে তাহা বন্ধ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ..... চাউলের দর বাঁধিবার সঙ্গে সঙ্গে চাউল বাজার হইতে অদৃশ্য হইয়াছে। লোকে ৪০/- ৪৫/- টাকা দিয়াও যাহা পাইতেছিল, তাহাও এখন একেবারে দুষ্প্রাপ্য।"

১৩৫০ সালের শ্রাবণ সংখ্যার 'ভারতবর্ষ' জানাচ্ছে, ".... শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে নিখিলবঙ্গ খাদ্য সম্মিলন হইয়াছিল তাহাতে গৃহীত ... একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, 'খাদ্য সংকটের সুযোগ লইয়া যাহারা প্রচুর লাভ

করিতেছে এবং যাহারা প্রচুর খাদ্যশস্য লুকাইয়া রাখিয়াছে বা মজুত করিয়াছে, তাহাদিগকে শায়েস্তা করিবার জন্য সম্মেলন গভর্ণমেন্টকে অনুরোধ করিয়াছে।"

ঐ একই পত্রিকা ১৩৫০ এর ভাদ্র সংখ্যায় জানাচ্ছে, "সম্প্রতি অসামরিক সরবরাহ সচিবের দপ্তরখানা হইতে প্রচারিত এক বিবৃতিতে প্রকাশ যে, গত ৭ই জুন মজুত ধান্য উদ্ধারের জন্য প্রদেশব্যাপী অভিযান আরম্ভ হইয়াছে।"

১৩৫০ সালের ১১ আষাঢ় সংখ্যার 'দেশ' জানাচ্ছে, "এক পক্ষকাল অতিবাহিত হইতে চলিল, বাঙলাদেশে সরকারের নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী মজুতবিরোধী অভিযান আরম্ভ হইয়াছে।"

১৩৫০ সালের ২০ পৌষ সংখ্যার 'জনযুদ্ধ' জানাচ্ছে, "আমলাতন্ত্র এখনও শহরতলীতে রেশনিং চালু করে নাই। রেশনিং না করার অর্থ মজুতদারকে গ্রাম হইতে চাউল কিনিয়া আনিয়া শহরে চোরাবাজার ফাঁদিবার সুযোগ দেওয়া। সমস্ত শহরে চোরা বাজার নষ্ট করিয়া গ্রামের প্রয়োজনীয় চাউল গ্রামে রাখিবার ব্যবস্থা করা। প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সমানভাবে বন্টন করা হউক - এই দাবীই রেশনিং-র দাবী। এ দাবী আজ প্রত্যেক নরনারীর মূল গণতান্ত্রিক দাবী। অবিলম্বে প্রত্যেক শহরে রেশনিং চাই, গ্রাম অঞ্চলে বাঁধা দরে সকল জিনিস বিক্রির ব্যবস্থা চাই।"

দুর্ভিক্ষের ফলে গ্রামের মানুষের মধ্যেও দেখা দিল প্রচলিত বিশ্বাস, মূল্যবোধের দারুণ অবক্ষয়। ক্ষুধার তাড়নায় কাপালীদের ছোট বৌ রাজী হয়ে যায় দীঘির পাড়ের বড় ইটখোলায় যেতে। অনঙ্গ বৌ-র আপত্তি তার কাছে গ্রাহ্য হয় না। বিভূতিভূষণ দেখালেন নারীর সেই আদিম জীবিকার ছবি, একমুঠো ভাত চেয়ে মানুষের অবনমনের ছবি। 'কাপালি বৌ আধঘন্টা পরে ইটখোলা থেকে বেরুলো, আঁচলে আধ পালি চাল। পেছনে পেছনে আসছে যদু পোড়া। অন্ধকার পথের দুধারে আশশেওড়া বনে জোনাকি জ্বলছে।' বিভূতিভূষণ দেখালেন নর-নারীর এই সম্পর্কে মাধুর্য নেই আছে অন্ধকারের কালিমা। যদু-র সহানুভূতির (অন্ধকারে একটু এগিয়ে দেওয়া) আসল নাম সুযোগসন্ধান। কাপালি বৌ জানে তাই সে তিরস্কার করে। কিন্তু যদুও জানে কাপালি বৌ আবার তার কাছে আসতে বাধ্য হবে তাই সে থমকে গিয়েও থামে না, বলে - 'চাল আর কিছু আমি যোগাড় করছি, পরশু সন্দেবেলা আসিস।' বলা বাহুল্য গ্রামবাংলা জুড়ে কাপালি বৌদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সমসাময়িক পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠাতেও উঠে আসছে এই সংবাদ।

১৩৫০ কার্তিক সংখ্যার 'প্রবাসী' জানাচ্ছে, "বাংলার দুর্ভিক্ষে বহু জটিলসমস্যার মধ্যে একটি সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে।' পারিবারিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন বহু নারী, যুবতী ও কিশোরী আহারান্বেষণে পথে পথে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। ক্ষুধার

জ্বালায় কুলোকের প্ররোচনায় পড়িয়া ইহারা অবাঞ্ছনীয় জীবনযাত্রায় বাধ্য হইবে ইহা আদৌ অস্বাভাবিক নহে।"

১৩৫১-র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'মাসিক বসুমতী' জানাচ্ছে, "নিখিলবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্পাদকের বিবৃতিতে বলা হইয়াছে - দুর্ভিক্ষের পর .... আমাদের যে সকল দুর্ভাগা ভগিনী সাধারণ স্বাভাবিক অবস্থাভ্রষ্ট হইয়াছেন, তাহারাই বিশেষভাবে কষ্টে পড়িয়াছেন। দুর্গতির জন্য বাধ্য হইয়া কেহ কেহ পাপ পথের পথিক হইয়াছেন। সমিতিরা স্বীকার করিয়াছেন, লোকে দুর্গত নারীর দুর্গতির সুযোগ লইয়া তাহাদিগকে পাপে লিপ্ত করিতেছে, ব্যবসা করিতেছে।"

১৩৫০ এর ১লা বৈশাখ সংখ্যার 'দীপালী' জানাচ্ছে, "স্ত্রীলোকও উদরান্নের জন্য শ্লীলতাহানি বরণ করিতেছেন।"

১৩৫০ এর ৮ই মাঘ সংখ্যার 'দেশ' জানাচ্ছে, "দুর্ভিক্ষের ফলে বাংলার বহু নারী সর্বস্ব হারা হইয়াছে। স্বাভাবিক গার্হস্থ্য এবং সমাজজীবন বিপর্যস্ত হইয়া পড়ায় অনেক নারী ও শিশু সম্পূর্ণ অনাথ ও নিরাশ্রয় হইয়াছে। .... বাঙলা দেশের মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়া দিয়াছেন যে, দুর্ভিক্ষের ফলে অসহায় তরুণী নারীদিগকে লইয়া পাপ ব্যবসায় চলিতেছে। এক দল দুর্বৃত্ত এই পাপ ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইয়াছে।"

উপন্যাস যত এগিয়েছে দেখা গেছে ক্ষুধার করাল থাবার ছায়া ক্রমশ আরো বেশী করে ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামের উপর। নতুন গাঁয়ে চাল ফুরিয়েছে, বিশ্বাস মশাই গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে প্রাণ ও চাল রক্ষার তাগিদে। নতুন গাঁ থেকে সাত ক্রোশ দূরে কুলেখালিতে এক সদ্‌গোপ গৃহস্বামীর কাছে গঙ্গাচরণ এবং সাধু কাপালী যায় চালের সন্ধানে। এদিকে যখন 'একদিন অনঙ্গ বৌ রান্নাঘরে রান্না করচে, হঠাৎ পাঁচ-ছটি অর্ধউলঙ্গ জীর্ণশীর্ণ স্ত্রীলোক, সঙ্গে তাদের সম্পূর্ণ উলঙ্গ বালক-বালিকা - ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো - ফ্যান খাইতাম - ফ্যান খাইতাম - ।' এদের দেখে অনঙ্গ বৌ-র মনে হয়েছে 'এমন অবস্থা দাঁড়িয়েচে নাকি যে দেশ ছেড়ে এদের বিদেশে আসতে হয়েছে ছেলেমেয়ের হাত ধরে এক মগ ফ্যান ভিক্ষে করতে?' অনঙ্গ বৌ-র মন চেয়েছে এদের প্রত্যেককে দুটি ভাত দিতে অথচ তার ঘরেও চাল বাড়ন্ত তাই সহানুভূতি অনুভব করলেও ব্যবহারে তা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। আমাদের মনে পড়ে যায় মানুষ খাদ্যের সন্ধানে কোথা থেকে কোথায় চলে গেছে দুর্ভিক্ষের সময়ে। সদ্‌গোপ গৃহস্বামীও ব্রাহ্মণ গঙ্গাচরণকে বিমুখ করতে চায়নি বসে ভাত খাওয়াতে চেয়েছে কিন্তু চাল দিতে চায় নি। দুর্ভিক্ষের অবস্থা যত সঙ্গীন হয়েছে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ মুছে গেছে, সব একই শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়েছে - সে শ্রেণী নিরন্ন, ভিক্ষুকশ্রেণী। অথচ

এরা পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস হারিয়েছে, সহানুভূতি হারিয়েছে, সহযোগিতা হারিয়েছে।

১৯৪৩ সন ৯ই সেপ্টেম্বর 'যুগান্তর' পত্রিকায় একটি সংবাদে প্রকাশ, "কাঁথি মহকুমার অবস্থা দিনের পর দিন অতি সাঙ্ঘাতিক হইয়া উঠিতেছে, মায়েরা দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগকে রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না। প্রত্যহ শহরের রাস্তায় ৪/৫ বছরের অস্থিকঙ্কালসার শিশুরা একা একা খাদ্যের জন্য ঘুরিয়া বেড়ায় - ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাস্তায় পড়িয়া মরিতেছে।.... গত আগষ্ট মাসে এই শহরের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে ১২৭ জন লোক অনাহারে রাস্তায় পড়িয়া মরিয়াছে। পল্লী অঞ্চলের মৃত্যুসংখ্যাও ভয়াবহ।"

'ভারতবর্ষ' পত্রিকা ১৩৫০ সনের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় জানাচ্ছে, ঢাকা জেলার মহকুমা শহর ও পূর্ববঙ্গের একটি বড় বাণিজ্য কেন্দ্র নারায়ণগঞ্জে "গত আগষ্ট সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে শহরের নিকটবর্তী গ্রামের বহু লোক খাদ্যাভাবে ভিক্ষার জন্য শহরে আসিয়া রাজপথে মারা গিয়াছে।.... ১৮ই অক্টোবর পর্যন্ত মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষকে রাজপথ হইতে ৪৫৩টি বেওয়ারিশ মৃতদেহ উঠাইয়া দাহ করিতে হইয়াছে।.... ত্রিপুরা জেলার গৌরীপুর ইউনিয়নের মধ্যে ২ মাসে ৫ শত লোক মারা গিয়াছে।.... মৈমনসিংহ জেলার পল্লী অঞ্চলের অবস্থা যেমন মর্মন্তুদ, তেমনই ভয়াবহ। কচু গাছ ও নানা লতাজাতীয় গাছ আজকাল গ্রামে খুব কমই দেখা যায়, গ্রামবাসীরা ইহাই তাহাদের বর্তমানের একমাত্র সম্বল করিয়াছে। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব কেহই কাহারও দিকে ফিরিয়া তাকায় না।..... শত শত লোক প্রতিদিন এই জেলায় মারা যাইতেছে। সমস্ত জেলাটাই যেন শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে।"

ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু মহাশয়ের একটি বিবৃতি প্রকাশ পায় ১৩৫০ সনের কার্তিক সংখ্যার 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায়। সেখানে তিনি জানান - "সর্বত্রই একটি অবিশ্বাস্য দুর্গতি দেখা যায়, সহর ও পল্লী অঞ্চল উভয়তঃই জনসাধারণের অনশন ব্যতীত গত্যন্তর নাই; কিন্তু সহর অঞ্চল অপেক্ষা পল্লী অঞ্চলের অবস্থা আরও শোচনীয়।গ্রামবাসীদের বিশেষত নারী ও শিশুদের কষ্ট দেখিলে চোখে জল আসে। ঢাকা, চাঁদপুর প্রভৃতি কয়েক স্থানে দুঃস্থ নিবাস খোলা হইয়াছে। ....তথাপি যেখানেই যাওয়া হউক না কেন, সেইখানেই মৃতদেহ এবং অনাহারে শীর্ণ লোক দেখা যায়।রাস্তার নিঃস্ব লোকদিগকে চলন্ত মৃতদেহের ন্যায় দেখায়।"

১৩৫০ সনের ৬ মাঘ, স্বাধীনতাদিবস সংখ্যায় 'জনযুদ্ধ' জানাচ্ছে, "মফঃস্বল অঞ্চলে এখনও খাদ্য পরিস্থিতি সংকটজনক বলিয়া বহুসংখ্যক দুর্গত ব্যক্তি পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া জমায়েত হইতেছে। গৃহস্থের দরজায় ক্ষুধিতের মর্মভেদী চীৎকার অনেকদিন বন্ধ ছিল, আবার কয়েকদিন হইতে সেই চীৎকার শুরু হইয়াছে। রাত্রে

গৃহস্থের দরজায় আবার আর্তনাদ উঠিতেছে, 'মা এক মুঠো ভাত দাও।' এই নূতন দুঃস্থের দল কোথা হইতে আসিতেছে? সরকারি প্রেস নোটে বলা হইয়াছে, অবস্থা উন্নতির দিকে যাইতেছে, কিন্তু কলিকাতায় নূতন দুঃস্থের মিছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থার পরিচয় দেয়।"

সাময়িক পত্রের পাতায় পাতায় বিধৃত এইসব তথ্যই সম্বলিত হয়েছে 'অশনিসংকেতে'র পৃষ্ঠায়। বলা বাহুল্য উপন্যাস সাময়িক পত্র নয় তাই তথ্য সেখানে হাজির হয়েছে রসসিদ্ধভাবে। মন্বন্তরে মানুষের মৃত্যুর মিছিলকে ঔপন্যাসিক চিহ্নিত করেছেন মতিমুচিনীর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে। ভাতছালা গ্রামের মতিমুচিনী ক্ষুধার জ্বালায় নিজের ভিটে ছেড়ে এসে মরল নতুন গাঁয়ে। নতুন-গাঁয়ের ক্ষুধ্‌পীড়িত মানুষের গতিই বুঝি চিহ্নিত করে মতির এহেন মৃত্যু। এ মৃত্যু আর ব্যক্তি বিশেষের বিচ্ছিন্ন মৃত্যু নয়। এ মৃত্যু ভবিষ্যতের মৃত্যু-মিছিলের অশনি সংকেত।

শুধু 'অশনিসংকেত' নয় তেতাল্লিশের মন্বন্তরের তথ্যকে ভিত্তি করে তৈরী হয়ে উঠেছে আরো অনেক উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা, নাটক, গান। উল্লেখ্য উপন্যাস হল - তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মন্বন্তর' (১৯৪৪), গোপাল হালদারের ত্রয়ী উপন্যাস - 'পঞ্চাশের পথ' (১৯৪৪), 'উনপঞ্চাশী' (১৯৪৬) ও 'তেরশ পঞ্চাশ' (১৯৪৫), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিন্তামনি' (১৯৪৬), সুবোধ ঘোষের 'তিলাঞ্জলি' (১৯৪৪), অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'আকালের সন্ধানে' (১৯৮২)। উল্লেখ্য ছোটগল্প হল - বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভিড়', 'পার্থক্য', 'বরোবাগদিনী', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পৌষলক্ষ্মী', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর 'কেরোসিন', 'হাড়', 'বস্ত্র'; প্রবোধকুমার সান্যালের 'অঙ্গার', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসনীয়' প্রভৃতি।

উল্লেখ্য নাটক হল - বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন'; তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার'; শচীন সেনগুপ্তের 'রাজধানীর রাস্তায়'; বনফুলের 'নমুনা' প্রভৃতি।

উল্লেখ্য কবিতা হল - বিষ্ণু দের 'চালের কাতারে', সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি'; প্রেমেন্দ্র মিত্রর 'ফ্যান'; সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'স্বাগত'; কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তর 'মেঘমুক্ত' প্রভৃতি।

সাময়িক পত্রের পাতায় যা ছিল তথ্য সাহিত্যে তাই পরিবেশিত হয়েছে গল্প-উপন্যাস রূপে। সাময়িক পত্রের অসংখ্য নাম না জানা কর্মী মৌমাছির মতই অক্লান্তভাবে সঞ্চিত করেন অসংখ্য খবর, রিপোর্ট, তথ্য। সাহিত্যিকের রসস্রষ্টা মন সেই তথ্যভাণ্ডার থেকেই খুঁজে নেয় আপন আপন সৃষ্টির জগৎ। সমকালকে ধারণ করে সাময়িক পত্র আর তার থেকেই জন্ম নেয় ভবিষ্যতের সাহিত্য। আর এখানেই সার্থক হয়ে ওঠে সাময়িক পত্র এবং সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক।

সহায়কগ্রন্থপঞ্জী ঃ-

১) বাংলা সাময়িক পত্র (১৮১৮ - ১৮৬২)	শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
২) অশনিসংকেত (উপন্যাস)	শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩) অশনিসংকেত (আলোচনা)	শ্রী মদনমোহন কুমার
৪) সাহিত্য-টীকা	শ্রী সনৎকুমার মিত্র
৫) উপোসী বাঙলা (সম্পাদনা)	শ্রী কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-নারীর বিদ্যাচর্চা ঃ সুযোগ ও সম্ভাবনা

শুভময় ঘোষ
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

।।১।। আদর্শগতভাবে শিক্ষা হল ব্যক্তির অন্তরশায়িত পূর্ণতার অভিব্যক্তির উপায়। মানুষের অন্তর্নিহিত যে সুপ্ত প্রতিভা ও অসীম সম্ভাবনা -- তারই ক্রমিক উন্মোচন শিক্ষা দানের লক্ষ্য। পরিবার ও সমাজের দিক থেকে একদিকে এর উদ্দেশ্য ব্যক্তির চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠন, অন্যদিকে ব্যবহারিক জীবনে --নানান বৃত্তিভোগী ও জীবিকা নির্ভর সমাজে ব্যক্তিকে জীবন ও জীবিকার উপযুক্ত করে তোলা। সেই সুযোগ্য নাগরিকের বিদ্যা, বুদ্ধি, মেধা, মনন ও কাজে ভর দিয়েই আবার একটি জাতি এগিয়ে যাবে উন্নততর ভবিষ্যতের দিকে। বিদ্যা বা জ্ঞানচর্চার এই বিচিত্রগামী , বহুমুখী কর্মকাণ্ডে প্রথাগত , পুঁথিকেন্দ্রিক শিক্ষার গুরুত্ব সমস্ত দেশেই স্বীকৃত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের মধ্যকালীন পর্বে এই বিদ্যা চর্চাকে হিন্দু সমাজ নারীর জন্য কতটা আবশ্যিক বলে মনে করেছিল , কেমন ছিল সে-কালের নারীর শিক্ষা লাভের সুযোগ , কতদূর বিস্তৃত ছিল সেই শিক্ষার পরিধি, সর্বোপরি সমাজের আধিপত্যকারী পুরুষের কাছে এই নারী শিক্ষার গুরুত্বই বা কতখানি ছিল -- সেই প্রশ্নগুলিই বিশ্লেষিত হবে বর্তমান নিবন্ধে। কিন্তু তার আগে এই আলোচনার পটভূমি হিসাবে মধ্যযুগের বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার একটি রূপরেখা তুলে ধরা যেতে পারে।

।।২।। এদেশে, সেই প্রাচীনকাল থেকেই বিদ্যা বা জ্ঞানচর্চার সঙ্গে ধর্মের ছিল ওতপ্রোত সম্পর্ক। হিন্দু বর্ণবিভাজিত সমাজ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণের স্থান ছিল অন্য সব বর্ণের শীর্ষে। একমাত্র তাদেরই ছিল ধর্ম জগতে গুরু হবার একচ্ছত্র অধিকার । ফলে, প্রাচীনকালে শিক্ষার সুযোগ ও প্রসার মোটামুটি ভাবে সীমাবদ্ধ ছিল ব্রাহ্মণদের মধ্যেই। অবশ্য, পরে ব্রাহ্মণ ছাড়াও কায়স্থ ও বণিক সম্প্রদায় বিদ্যার্জনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। কিন্তু, শূদ্রের জন্য সর্বতোভাবেই নিষিদ্ধ ছিল শাস্ত্রপাঠ। শাস্ত্র গ্রন্থ রচিত হতো যে সংস্কৃত ভাষায়, সেই দেব ভাষার চর্চায় শূদ্রের কোনো অধিকার ছিল না। বঙ্গেও মোটামুটিভাবে হিন্দু -শাসনকাল পর্যন্ত এই আদর্শ বলবৎ ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু তুর্কি আক্রমণোত্তর কালে মুসলমান শাসনে শিক্ষা শুধুই সামাজিক সম্মান লাভের হাতিয়ার হয়ে রইল না, ক্রমে তা হয়ে উঠল জীবিকা অর্জনের অন্যতম হাতিয়ার। সুলতান , নবাবের দরবারে এবং প্রশাসনে চাকরি জোটানোর জন্য শিক্ষা হয়ে উঠল অপরিহার্য। বিজিত জাতির বিশেষ কোনো বর্ণের প্রতি বিজয়ী জাতির পক্ষপাত না থাকায় বর্ণনির্বিশেষে যে কোন

মানুষই শিক্ষাগত যোগ্যতায় বিধর্মী শাসকের প্রশাসনে গৃহীত হতে পারত। ফলে, জীবন জীবিকার তাগিদ ব্রাহ্মণের আধিপত্যমূলক অধিকার থেকে বিদ্যাকে মুক্ত করে সকলকেই শিক্ষার অঙ্গনে সমানভাবে আমন্ত্রণ জানালো। সংকীর্ণ সীমা ভেঙে শিক্ষার বিস্তার হতে থাকলো সংকর বর্ণের মানুষের ভিতর। সমাজ বিন্যাসে নিম্নতর স্থানে থাকা শূদ্ররাও উচ্চবর্ণের শিক্ষার্থীর পাশে বসে গুরুর কাছ থেকে বিদ্যার্জনের সুযোগ পেল। নিঃসন্দেহে, "বাংলার মুসলমান শাসনের এটাও একটা শুভদায়ক ফলশ্রুতি" পাঠশালা, টোল, চতুষ্পাঠীতেও ক্রমে বিদ্যাদানের কাজে এগিয়ে এলেন নিম্নবর্ণের গুরুমশাই, পণ্ডিত, আচার্যেরা। এই প্রসঙ্গে নাম করা যেতে পারে ধর্মদাস (বেনে), রামদাস আদক (কৈবর্ত), হৃদয়রাম সাউ (শুঁড়ি), কৃষ্ণজীবন দাস (মোদক) প্রমুখের।

।।৩।। হিন্দু সমাজে প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্র ছিল পাঠশালা, আর উচ্চ শিক্ষার জন্য ছিল টোল ও চতুষ্পাঠী। পাঁচ বছর বয়সে হাতে খড়ির মধ্য দিয়ে হিন্দু বালক প্রবেশ করত বিদ্যার জগতে। এরপর গুরুমশাইয়ের কাছে পাঠশালায় ধীরে ধীরে অক্ষর পরিচয়, যুক্তাক্ষর শিক্ষা, বর্ণযোজনা এবং লিখনাভ্যাস। মাতৃভাষার চর্চার পাশাপাশি পাঠশালে ছাত্রকে গণিতের সাধারণ জ্ঞানও দেওয়া হতো। কেননা দৈনন্দিন জীবনে হাটে-বাজারে, বেচা-কেনায় রাশি জ্ঞান জরুরি ছিল। তার পাশাপাশিই "চাষির ছেলেকে ধান, চাল, গুড়, ইত্যাদির হিসাব, স্বর্ণকারের ছেলেকে সোনা-রূপা-পিতলের ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাব, বৈদ্য সন্তানকে চিকিৎসায় তোলার পরিমাপ, ঘরামি ও রাজমিস্ত্রির ছেলেকে দেওয়াল, পুষ্করিণী, নৌকা, ইত্যাদির কালি করতে শেখানো। আমিনের ছেলেকে জমি-জমার মাপ, পাট্টা, কবুলতি, জবানবন্দি, মোক্তারনামা, এত্তেলানামা, সমনজারি, ইস্তেহার, ইত্যাদি লেখা শেখানো হতো।" সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বৃত্তিধারী মানুষকে প্রাথমিক জীবনের উপযোগী করে তোলা হত। সে কালের পাঠশালায় আর একটি শিক্ষণীয় বিষয় ছিল পত্র লিখন। আর এ সমস্ত কিছুর সঙ্গেই নবীন শিক্ষার্থীকে চরিত্র গঠনের উপযোগী নীতি-উপদেশ ও সামাজিক সৌজন্যের শিক্ষাও দেওয়া হতো। সমাজের নিম্ন বর্ণের মানুষের মধ্যে যে- অল্প সংখ্যক বিদ্যার্জনের সুযোগ পেতেন , তাদের বিদ্যা শিক্ষা প্রায়শই এই পাঠশালাতেই সমাপ্ত হতো। জীবন ও জীবিকার অমোঘ দাবিতে এরপর তারা বংশগত বৃত্তিতেই আত্মনিয়োগ করত। কিন্তু উচ্চবর্ণ, অভিজাত, বা মধ্যবিত্ত পরিবারে -- যাদের কাছে শিক্ষা ছিল পারিবারিক ঐতিহ্য ও সামাজিক সম্মান লাভের বিষয়, তারা এরপর পাঠশালার গণ্ডি পার হয়ে পড়তে যেত টোল ও চতুষ্পাঠীতে। টোলে পড়ানো হতো ব্যাকরণ, ছন্দ, অলংকার শাস্ত্র, অভিধান, সাহিত্য। চতুষ্পাঠীতে শিক্ষার্থী পেত জ্যোতিষ, তর্ক, আগম, পুরাণ, বেদ, যোগ, ন্যায়, ধর্মতত্ত্বের জ্ঞান। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে, এই নব্যন্যায়

চর্চার কেন্দ্র হিসাবেই পঞ্চদশ, ষোড়শ শতকের নবদ্বীপ ভারত জোড়া খ্যাতি পেয়েছিল। আবার মুঘল আমল থেকে প্রশাসনিক স্তরে ফার্সি ভাষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় হিন্দু বিদ্যার্থী এই ভাষা শিক্ষার জন্য উদগ্রীব ছিল। ধর্মীয় ছুঁৎমার্গের দোহাই দিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রাখা হিন্দু সমাজবিধাতাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রায়োজনিকতার তাগিদ এমন ভাবেই খুলে দিচ্ছিল শিক্ষার নতুন দরজাগুলি। " আর্শী আর্শী আর্শী/ স্বামী পড়ুক ফার্সী"- ছড়ায় কুমারী মেয়ের এহেন কামনাও সেকালের সমাজে বিদ্যাচর্চার বাস্তব উপযোগিতার দিকটিকে চিনিয়ে দেয়।

মুখ্যত সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী, জমিদার, সামন্তদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও অর্থ সাহায্যে পরিচালিত মধ্যযুগের এই শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা না থাকলেও, মুঘল আমলে - বিশেষত, আকবরের শাসনকালে শিক্ষাদানের একটি রাষ্ট্রীয়-সামাজিক লক্ষ্যের উপর জোর দেওয়া হয়। ছাত্রদের পাঠ্যবিষয় ও পাঠদান প্রক্রিয়ায় শিক্ষকদের ভূমিকা সম্পর্কে 'আইন-ই -আকবরী'তে আকবর বলেছিলেন -

"Every boy ought to read books on morals,arithmetic, agriculture, menusuration geometry, astronomy, medicine, logic, the tabaii, riyaze, science and history of all which may be gradually acquired .... care to be taken that he learns to understand everything himself. But the teacher may assist him a little, the teacher ought especially to look after five things; knowledge of the letters; meaning of words, the hemstich; the verse, the former lessons".

।।৪।। সেকালের হিন্দু-বাঙালি সন্তানদের বিদ্যাচর্চার ছবি বিশদ ভাবেই ধরা পড়েছে সে যুগের বাংলা আখ্যান কাব্য গুলিতে। মনসা, চণ্ডী, ধর্মমঙ্গল কাব্যে কিংবা গোপীচন্দ্রের গানে লখিন্দর, শ্রীমন্ত, লাউসেন, গোপীচন্দ্রের 'হাতে খড়ি' অনুষ্ঠানের উল্লেখ মিলেছে। মানিক রামের ধর্মমঙ্গলে দশ দিনের বালক বিদ্যার্থীর বর্ণ-পরিচয় সম্পূর্ণ হওয়ার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। কাব্য কাহিনীর এই নায়কদের অধীত বিদ্যার বহরটিও রীতিমত সম্ভ্রম জাগিয়ে তোলে। ন্যায়শাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, গণবৃত্তি, কোষশাস্ত্র, বৃত্তিবৃত্তি, ভট্টিকাব্য, অভিধান, ব্যাকরণ, পুরাণ, আগম, স্মৃতি, অলংকারশাস্ত্র, সাহিত্যদর্পণ, কালিদাসের কাব্য -- কমবেশি সবেতেই এরা ছিলেন পারঙ্গম। অবশ্য নায়কের রূপগুণ বর্ণনায় কবিরা আদর্শের এক সর্বোচ্চ সীমাকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন--আর সেদিক থেকে এই ফর্দ তৈরীতেও কিছুটা আতিশয্য, অতিরেক, থেকে থাকতে পারে। তবু তা থেকে সেকালের ছাত্রমণ্ডলীর কাছে উন্মুক্ত বিদ্যাপ্রাঙ্গনটি দেখে নেওয়া যায়। জীবিকার প্রয়োজনে চতুর্ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা পাওয়া যাচ্ছে

অষ্টাদশ শতকে নরসিংহ বসুর লেখা ধর্ম মঙ্গল কিংবা দয়ারাম দাস র
'শীতলামঙ্গল'-এ। অষ্টাদশ শতকের কবি ভারত চন্দ্র বিদ্যার্জনে বেরিয়ে শুধুই সংস্কৃ
ভাষা শিক্ষা করে গৃহে ফিরে এসেছিলেন বলে অভিভাবকের কাছে ভর্ৎসি
হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত বলে নেওয়া দরকার যে, যোগ্য গুরুর কাছে যোগ্য বিষয়ে প
নেবার তাগিদে-সে যুগে বঙ্গ সন্তানকে স্বজন, পরিবার ছেড়ে প্রায়শই যাত্রা কর
হয়েছে দেশান্তরে, গুরুগৃহে। ভারতচন্দ্রের মতোই কবি কৃত্তিবাসও বিদ্যালা
অভিলাষে 'বড় গঙ্গা' পার হয়ে গিয়েছিলেন বরেন্দ্রভূমিতে। ষোড়শ শতকে বাংল
বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনের বরিষ্ঠ নেতা অদ্বৈত আচার্যও কৈশোরে দ্বাদশ বর্ষ বয়
ষড়দর্শন পড়বার আশায় গুরুগৃহে যাত্রা করেছিলেন।

।।৫।। কিন্তু ইতিহাস ও সাহিত্যের এই পরিপূরক সাক্ষ্যই প্রমাণ করে দেয়, বাং
সাহিত্যের বিস্তৃত মধ্যযুগে বিদ্যাচর্চার এই সুযোগ প্রায় সম্পূর্ণত সীমাবদ্ধ ছিল পুরু
জন্যই। সমাজের অর্ধাংশ নারীরা এই শিক্ষার ভুবনে বড় একটা প্রবেশাধিকার পায় নি
'পুঁথিপত্রের আঙিনায় সমাজের আলপনা' গ্রন্থে চিত্রা দেব তাই অনেক খে
বলেছিলেন যে, মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে আমরা গার্গী- লীলাবতীর পরেই ক
করে চলে আসি জ্ঞানদানন্দিনী-স্বর্ণকুমারীর যুগে। আসলে সুদূর অতীতকাল থেকেই
ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজ ও শাস্ত্র নারীদের গৃহের চতুঃসীমায় বদ্ধ রাখতে আগ্রহী ছি
কঠোরভাবে পুরুষতান্ত্রিক সে সমাজে নারী মুখ্যত অবরোধবাসিনী ও অন্তঃপুরচারি
বাইরের বৃহত্তর জগতের দরজা তার জন্য বন্ধ ছিল। এর পিছনে ছিল ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে
সুকঠোর বর্ণবিভাজন ও সেই সমাজ-সংস্থানে রক্তের বিশুদ্ধতা বজায় রাখার অতন্দ্র
প্রয়াস। এরপর উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণরা নিম্নবর্ণের নারীকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে শু
করলে নিষিদ্ধ হয়ে যায় নারীর বেদপাঠ ও শাস্ত্রাধ্যয়ন। নারী হারায় উপনয়নের অধিক
- আর্যসমাজে যা ছিল বিদ্যাচর্চায় প্রবেশদ্বার। ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও তার অধিকার ছিল ন
মন্ত্রোচ্চারণের। মন্ত্রবর্জিত, ব্রাত্য শূদ্রের সঙ্গে একই বন্ধনীতে রেখে নারীকেও নির্বাস
দেওয়া হয় বিদ্যাক্ষেত্র থেকে । শিক্ষার সমাজসিদ্ধ অধিকার ছিল শুধুমাত্র সেইস
নারীদের জন্য সমাজের ক্ষুধা মিটিয়েও যারা পড়ে থাকতেন সমাজের এককোণে--- যা
গণিকা বা স্বৈরিণী । যাদের কাজ ছিল নির্বিচারে সকল অর্থবান প্রার্থীর মনোরঞ্জন
একমাত্র তারাই রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে হয়ে উঠতেন শাস্ত্রবেত্তা, চতুঃষষ্টি কলায় পারদর্শী
কিন্তু সাধারণ নারীর ক্ষেত্রে সমাজের দৃষ্টি ছিল রক্ষণশীল।

ব্রাহ্মণ্যবাদের এই দমন এবং পুরুষদের প্রবল প্রতাপ সত্ত্বেও বৈদিক যুগে এবং
তৎপরবর্তী কালেও কিছু নারী আপন স্বাতন্ত্র্যে এক্ষেত্রে ভাগ্যকে জয় করতে
পেরেছিলেন। শৌণকের বৃহদ্দেবতায় ঘোষা,গোধা, বিশ্ববারা, প্রমুখ সাতাশজন

ব্রহ্মবাদিনী লেখিকার নাম পাওয়া যায়। সংস্কৃত বিভিন্ন কোষকাব্য ও অলংকার গ্রন্থগুলিতে প্রায় চল্লিশজন নারীর লেখা একশো পঞ্চাশটি প্রকীর্ণ শ্লোক পাওয়া গেছে। এইসব নারীদের মধ্যে বিকটনিতম্বা, সরস্বতী, বিজ্জকা,ভাবদেবী, শীলাভট্টারিকার নাম প্রণিধানযোগ্য। সংস্কৃতে 'আচার্যা' শব্দটির ব্যবহারে মনে হয়, সে-সময় বিদুষী নারীদের কেউ কেউ শিক্ষাজগতে গুরুর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে রাজশেখর তাঁর "কাব্যমীমাংসা" গ্রন্থে কবিত্বকে লিঙ্গনির্বিশেষে আত্মার ধর্ম বলে উল্লেখ করেছিলেন। আরও পরে হাল সংকলিত 'গাহাসত্তসঈ'তেও অনুলচ্ছী, পতঙ্গ, মাহবী, রেবা, রোহা, ইত্যাদি নারী কবির রচনা স্থান পায়। তবু একথা অস্বীকারের কোন উপায় নেই যে, শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী পুরুষদের সাহিত্য রচনার পাশে সংখ্যাগত দিক থেকে নারীদের প্রতিনিধিত্ব ছিল লক্ষণীয়ভাবে কম। বলা বাহুল্য, বিদ্যাচর্চায় তাদের ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন, একক অগ্রগতির পেছনে রক্ষণশীল, গোঁড়া সমাজের কোনই ভূমিকা ছিল না, ছিল কেবল কিছু ব্যক্তিগত প্রয়াস , পিতা ও স্বামীর উদ্যোগ, পারিবারিক সমর্থন। বরং সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পুরুষদের হাত যতই শক্ত হয়েছে, ততই নারীদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে শিক্ষার অধিকার-- মেয়েদের ঠেলে দেওয়া হয়েছে অন্তঃপুরের গহনে। তাই মুসলমান শাসনের আগেই উল্লেখযোগ্যভাবে কমে এসেছে ইতিহাসে বিদুষী নারীর সংখ্যা।

।।৬।। মধ্যযুগীয় বঙ্গে হিন্দুদের জীবনাচরণে যে 'মনুসংহিতার ' প্রভাব ছিল দুরপনেয়, সেখানে একটি শ্লোকে বলা হয়েছে --'কন্যাপেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি-যত্নতঃ' অর্থাৎ ছেলের মত মেয়েকেও শিক্ষা দিতে হবে ও পালন করতে হবে অতি যত্নে - একথা শুনতে শুনতে আমাদের আধুনিক মন যখন আশান্বিত হয়ে ওঠে, ঠিক তখনই পূর্ববর্তী শ্লোকাংশের শেষ অংশটিতে মনু বলে ওঠেন -- নারীর পক্ষে বিবাহই হলো উপনয়ন, পতিগৃহে বাস হলো গুরুগৃহে বাস আর পতি সেবাই হলো বেদাধ্যয়ন। বলা বাহুল্য, মধ্যযুগের বাংলা পুরুষশাসিত সমাজও মেয়েদের বিদ্যার্জনের ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যাকেই শিরোধার্য করেছিল এবং সে-জীবনকে ঠেলে দিয়েছিল অশিক্ষার অন্তরালে। তবু, আমাদের বিস্ময় জাগে এই দেখে যে, প্রাগাধুনিক কালপর্বে বাংলার নারী-শিক্ষার আকাশ একেবারে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে আচ্ছন্ন নয় । সেই অন্ধকার আকাশে আপন স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর হয়ে উঠেছেন করাঙ্গুলিমেয় কিছু অসাধারণ বিদুষী। বাংলার ব্যতিক্রমী সম্ভ্রান্ত পরিবারে, রাজঅন্তঃপুরে, সুলতান কিংবা নবাবের অন্দর মহলে নারীর শিক্ষার চল হয়তো ছিলই। কিন্তু আমরা বলছি এই সম্ভ্রান্ত সীমানার সমাজের বাইরে সমাজের সাধারণ উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত পরিবারের কোন কোন রমণীর কথা-- যাঁরা বিদ্যার জগতে অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এঁদের মধ্যে প্রায় সকলের শিক্ষা

সম্পন্ন হয়েছিল পিতা বা স্বামীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে, উৎসাহে, অভিভাবকত্ব বিদ্যাদানে। এঁরা হলেন ষোড়শ শতকের প্রিয়ংবদা দেবী, সতেরো শতকের বৈজয়ন্তী দ্বিজ বংশী দাসের কন্যা চন্দ্রাবতী, মানিনী দেবী, আঠারো শতকের আনন্দময়ী, হরি বিদ্যালঙ্কার।

প্রিয়ম্বদা ছিলেন ফরিদপুরের কোটালিপাড়ার সুপণ্ডিত শিবরাম সার্বভৌমের কন্যা। বাবার কাছেই তাঁর কাব্য, অলংকার, ব্যাকরণ ও ন্যায়ের শিক্ষা সম্পন্ন হয়েছিল। 'মদালসা উপাখ্যান'-এর দার্শনিক টীকা ছাড়াও মহাভারতের শান্তিপর্বের মোক্ষ বিষয়ে এই নারী টীকা রচনা করেছিলেন। 'শ্যামরহস্য' নামে ধর্ম বিষয় একটি গ্রন্থ তাঁর রচনা।

বৈজয়ন্তী দেবী ছিলেন ফরিদপুরের খানুকা গ্রামের মেয়ে। বাল্যকালেই নানা তিনি ব্যাকরণ ও ন্যায়শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। এক্ষেত্রেও অধ্যাপক পিতা ছিলেন কন্যার শিক্ষা গুরু। কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, ধর্মশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। স্বামী কৃষ্ণনাথের সঙ্গে মিলিতভাবে বৈজয়ন্তী 'আনন্দলতিকা' কাব্য রচনা করেছিলেন। স্ত্রীর সেই ভূমিকাকে কাব্যে স্বীকৃতি দিয়ে কৃষ্ণনাথ লিখেছেন 'আনন্দলতিকা গ্রন্থা যেনাকারি স্ত্রীয়া সহ'। স্বামী-স্ত্রী একত্রে শাস্ত্রালোচনা ও গ্রন্থরচনার এই দৃষ্টান্ত মধ্যযুগে বিরল।

মঙ্গল কাব্যধারায় যশস্বী কবি দ্বিজ বংশী দাসের কন্যা চন্দ্রাবতী সন্দেহাতীতভাবে বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবির সম্মান পেতে পারেন। যদিও তাঁর অনেক আগেই আবির্ভূত সহজ কবি চণ্ডীদাসের প্রণয়িনী রামীর ভণিতায় বেশ কিছু বাংলা পদ পাওয়া গেছে। -কিন্তু সেগুলির প্রামাণিকতা সন্দেহের বিষয়।

জয়ানন্দ নামে এক সহপাঠী ব্রাহ্মণপুত্রের সঙ্গে চন্দ্রার প্রথমে সখ্যতা, পরে প্রেম গড়ে ওঠে। কিন্তু জয়ানন্দের চারিত্রিক স্খলন সব আশাকে ভেঙে দেয়। এরপরেই পিতার নির্দেশে চন্দ্রাবতী আজীবন কুমারী থেকে শিবপূজা ও রামায়ণ রচনায় মন দেন। চন্দ্রাবতী রচিত রামায়ণ এক ব্যতিক্রমী , উজ্জ্বল, সংযোজন। সে কাব্যের আঙ্গিক, কাহিনী বিন্যাস, ঘটনাচয়নে কবির নারী মনের ছাপ সুস্পষ্ট। নারীর নিজস্ব অবস্থান থেকে তিনি রামায়ণের ঘটনাগুলি দেখেছেন। ফলে প্রতিষ্ঠানিক রামায়ণের তুলনায় চন্দ্রাবতীর রামায়ণে একটি 'মেয়েলি স্বরের অভিনবত্ব' ধরা পড়েছে। 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' সংকলনের 'কেনা ডাকাতের পালা' ও 'মলুয়া পালাও' চন্দ্রাবতীর রচনা বলে অনেক আলোচক মনে করেছেন।

উত্তরবঙ্গের মহামহোপাধ্যায় ইন্দ্রেশ্বর চূড়ামণির মেয়ে মানিনী দেবীও বেশ কিছু সংস্কৃত শ্লোক রচনা করেছিলেন । ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের আঠারো শতকের কবি

আনন্দময়ীও রীতিমত শাস্ত্রবিদ্ ছিলেন। সংস্কৃতে পাণ্ডিত্যের পাশাপাশি কাকা জনারায়ণের সঙ্গে মিলিতভাবে বাংলায় 'হরিলীলা' কাব্য লিখেছিলেন। সঙ্গীত রচনাতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। আনন্দময়ী ও তাঁর পিসতুতো বোন গঙ্গামণির লেখা বিয়ে, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের গান বিক্রমপুর অঞ্চলে বিশেষ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

হটু ও হটী বিদ্যালঙ্কার মধ্যযুগে বাংলার সারস্বত সমাজে সুপরিচিত নাম। হটুর আসল নাম রূপমঞ্জরী। কন্যার অসাধারণ মেধা দেখে পিতা নারায়ণ দাস তাঁকে ১৬-১৭ বছর বয়সে এক ব্রাহ্মণের চতুষ্পাঠীতে পাঠিয়ে দেন। সেখানে অধ্যয়ন করে রূপমঞ্জরী ব্যাকরণ, সাহিত্য, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। মাথা মুড়িয়ে শিখা রেখে পুরুষ পণ্ডিতের বেশ ধারণ করেছিলেন। নানান জায়গা থেকে ছাত্ররা তাঁর কাছে ব্যাকরণ, চরক, সংহিতা, নিদান ও আয়ুর্বেদের নানান বিষয়ে শিক্ষা নিতে আসত। অন্যদিকে হটী বিদ্যালঙ্কার ছিলেন রাঢ়ের এক কুলীন বাল্যবিধবা। সংস্কৃত, ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি, নব্যন্যায় সবেতেই তিনি ছিলেন পারঙ্গমা। সেকালে বারাণসীতে তিনি নিজে একটি চতুষ্পাঠী খুলে অধ্যাপনা করতেন। মধ্যযুগে এক কুমারী ও এক বিধবা নারীর এই সুতীব্র বিদ্যার্জন স্পৃহা ও একক, স্বাশ্রয়ী প্রতিষ্ঠা বিরলতম বলেই গণ্য হবে।

।।৭।। সমাজের এই প্রতিফলন ধরা পড়েছে সাহিত্যের পাতাতেও। সেখানেও উচ্চবর্ণীয়, উচ্চবিত্ত কখনও মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের বিদ্যাচর্চা করতে দেখা যায়। সমাজের নিম্নবর্ণীয়, নিম্নবিত্ত, কিংবা শ্রমজীবী পরিবারের নারীর ক্ষেত্রে এই শিক্ষা লাভের সুযোগ যে বিন্দুমাত্রও ছিল না, তা নিঃসন্দেহে অনুমান করা চলে। ঠাকুরমার ঝুলির পুরানো রূপকথায়, গোপীচন্দ্রের গানে, মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলে, আলাওলের 'পদ্মাবতী', দোনাগাজী চৌধুরীর 'সয়ফুলমুলুকবদিউজ্জামল' দয়ারামের 'সারদামঙ্গল', ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল', রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যাদিতে নারীর বিদ্যাচর্চার ছবি ধরা পড়েছে। অবশ্য ছেলেদের মত মেয়েদের হাতে খড়ি অনুষ্ঠানের কোন বর্ণনা এসব কাব্যে মেলে না। অর্থাৎ, বোঝা যায় মেয়েদের জন্য শিক্ষাকে আবশ্যক বলে মনে করেনি অতীতের সমাজ, পরিবার; ব্যতিক্রম যেখানে ঘটেছে সেটা পরিবার বা নিকটজনের বিচ্ছিন্ন প্রশ্রয়, একটু বাড়তি কৃপা-করুণা। এসব কাব্যের অনেকগুলিতেই পাঠশালায় 'দ্বিজ গুরুর স্থানে' কিংবা 'ছাত্রশালায়' নারীর পাঠ নিতে যাবার প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু, মধ্যযুগে লিঙ্গলাঞ্ছিত, অবরুদ্ধ পরিবেশে নারী যখন বাতাসের মত অস্তিত্ববান অথচ অদৃশ্য, অসূর্যম্পশ্যা তখন বালক-বালিকার কাছে একত্র গুরুর কাছে বিদ্যার্জন কতখানি বাস্তবোচিত - তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। অবশ্য ইতিহাসের চরিত্র হিসাবে চন্দ্রাবতী পাঠশালায় গিয়েছেন, রূপমঞ্জরীকে তাঁর পিতা পাঠিয়েছেন ব্রাহ্মণের চতুষ্পাঠীতে

কিন্তু আমরা ধরতে চাইছি সেকালের মূল প্রবণতাকে। বাড়িতে গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে মেয়েদের বিদ্যাভ্যাসের একটি ধারা ছিল অসামান্য অভিজাত পরিবারে, আর সাধারণ পরিবারে নারীর জ্ঞানলাভের সহায় হয়েছিল নিশ্চয়ই পারিবারিক শিক্ষার একান্তনিজস্ব বাতাবরণটি। সাহিত্যের পাতায় উঠে আসা এই মেয়েদের অনেকেই ইতিহাসের বিদুষীদের সমকক্ষ। ধর্মমঙ্গল কাব্যে লাউসেনের মা রঞ্জাবতী ছিলেন রীতিমত শাস্ত্রজ্ঞা। শেখ সাদীর 'গদামালিকা সম্বাদ' কাব্যের মল্লিকাও নানান শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিল। ভূগোল, পুরাণ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ধাঁধা, হেয়ালি, জগৎ সৃষ্টির অনেক বিষয়ই তাঁর নখদর্পণে ছিল। এই মল্লিকা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিল, যে-পুরুষ তাঁকে তর্কে পরাস্ত করতে পারবে তাকেই সে বরণ করবে স্বামীত্বে। একইভাবে ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' এর বিদ্যাও বীর্যশুল্কা নয় বিদ্যাশুল্কা হতে চেয়েছিল। পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্কে ব্যাকরণ, অভিধান, সাহিত্য, নাটক, অলংকার, বেদান্ত, মীমাংসা শাস্ত্র, বৈশেষিক দর্শন, পাতঞ্জল শাস্ত্র, সংহিতা, স্মৃতি, সাঙ্খ্য দর্শনে তাঁর বুৎপত্তির প্রমাণ মেলে। মধ্যযুগের শেষ লগ্নের কবি ভারতচন্দ্র বোধ হয় বিদ্যাকে সর্বশাস্ত্রে বিশারদ করে বিদ্যার গরিমায় পুরুষের সমকক্ষ করে তুলতে চেয়েছিলেন। জীবনের ভিন্নতর বিকাশের সম্ভবনার দরজা যেখানে বন্ধ , সেখানে অন্তত এই একটি দিক থেকে নারীকে পূর্ণতায় বিকশিত করে হয়তো মধ্যযুগের কবি নারীপ্রগতির শুভ সূচনা করে দিতে চেয়েছিলেন। আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যের নায়িকা বিদুষী পদ্মাবতী কিংবা ভারত চন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' এর বিদ্যা রাজদুহিতা। কিন্তু, সে-যুগের সাহিত্যে অনেক সাধারণ মেয়েরও শিক্ষার দৃষ্টান্ত, কখনও বা অসামান্য বিদ্যাবত্তার পরিচয় মিলেছে। 'সয়ফুলমুলুকবদিউজ্জামল' কাব্যে এক সামান্যা বেনে বউ এর পাণ্ডিত্যের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা মনে রাখার মতো -

"আছিল পণ্ডিত সেই বণিক বনিতা।
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ পণ্ডিত প্রচুর।।
পারগ সর্বজ্ঞ বিজ্ঞ পণ্ডিত প্রচুর।।

ঐ কাব্যেরই নিতান্ত সাধারণ ঘরের মেয়ে যোষীকন্যাও -

"নবীন যৌবনী কন্যা প্রসঙ্গে বিদুষী
যুক্তি অনুযুক্তা, যুক্ত উক্তি অতিরিক্তা ।।
বিলাসী সঙ্গীতভাষী কাব্য পরিভক্তা।
চাতুর্যে মাধুর্যে অতি বাচে অগ্রগণ্যা"।।

আবার 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যেও ধনপতির প্রথমা স্ত্রী লহনা যখন বান্ধবী লীলাবতীর সঙ্গে কু-যুক্তি করে স্বামীর নামে জাল পত্র রচনা করায়, তখন তার মধ্য দিয়ে লহনা ও লীলাবতীর শিক্ষার পরিচয় ধরা পড়ে। সতীন খুল্লনা সে চিঠি পড়েছিল - যা তার অক্ষর জ্ঞানের পরিচায়ক। সপ্তদশ শতকে রচিত 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র মলুয়ার পালায় মলুয়ার চিঠি লেখার প্রসঙ্গ আছে। । ঐ 'গীতিকার'ই অন্তর্গত কমলার পালায় নায়িকা কমলাও লম্পট যুবক কারকুনের চিঠি পড়েছিল। অবশ্য লীলাবতী, লহনা, খুল্লনা, মলুয়া, কিংবা কমলার বিদ্যা শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষার স্তর অতিক্রম করেছিল বলে মনে হয় না।

।।৮।। সুতরাং , সাহিত্য ও ইতিহাসের পরিপূরক সাক্ষ্যে নারী-শিক্ষার এই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পরিচয় থেকে এ কথাটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সেকালের হিন্দু সমাজে তৈরী হয়নি স্ত্রী শিক্ষার কোন পরম্পরা, রীতি - রেওয়াজ। বরং, সে-যুগের সমাজ মোটের উপর দাঁড়িয়েছিল স্ত্রী-শিক্ষার প্রতিকূলেই। 'নারীদের লেখাপড়া আপনা হতেই ডুবে মরা' এই ছিল প্রচলিত যুগ বিশ্বাস। ব্যতিক্রম যেটুকু ছিল সংখ্যাগত বিচারে তা নগণ্যসামান্য। ফলে -'লেখাপড়া নাহি জানি কহিব হৃদয়ে গুণি"-- কবিকঙ্কন চণ্ডীতে দুর্বলা দাসীর এই স্বীকারোক্তি বস্তুতপক্ষে অধিকাংশ নারীর ক্ষেত্রেই সত্য।

প্রাগাধুনিক বঙ্গে হিন্দু নারীর শিক্ষার এই প্রতিবন্ধকতার কারণ সন্ধান করতে গিয়ে দুটি প্রধান অন্তরায়ের কথা স্বভাবতই মনে আসে। প্রথমতঃ তুর্কি আক্রমণোত্তর কালে প্রতিক্রিয়াধর্মী হিন্দু সমাজে নারীর জন্য অবরোধ বা পর্দাপ্রথা অত্যন্ত দৃঢ় হয়ে ওঠে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের চারদেওয়ালের সীমায় জীবন যাপন করতে হতো। পাঠশালায় বা টোলে গিয়ে বালক বালিকাদের পাঠগ্রহণের যে চল ছিল, ক্রমশঃ তা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ আমাদের আলোচ্যকালে হিন্দু মেয়েদের বাল্যবিবাহ দেওয়ার রীতিও স্ত্রী-শিক্ষার পথে বিশেষ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিদ্যার্জন মেয়েদের জীবনে অকালবৈধব্যের কারণ - এমন কুসংস্কার তৈরী করে মেয়েদের শিক্ষাজগৎ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। যে সমাজের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে যুগ-যুগ ধরে এই বিশ্বাস লালিত যে , নারীর জীবনে স্বামীই তার সর্বস্ব, তার সুখ, সৌভাগ্য, আশ্রয় - সেই সমাজে সাধারণ কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা-মাতার মনে, এমনকি নারীর নিজের মনেও এই অর্থহীন বিশ্বাস প্রশয় পাবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

তাছাড়া, যে দেশে নারী বাল্যবিবাহের শিকার হয়, পুতুলখেলা ছেড়ে যাদের জীবনের সিংহভাগ কাটে আঁতুরঘরে আর পাকশালায় - সেখানে তাদের জন্য বিদ্যার্জনের অবসরই বা কোথায়? জীবন ও জীবিকার বিচিত্র সুযোগ ও আহ্বান ছিল বলেই শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্যকালে শূদ্রের কপাল খুলেছিল। অন্যদিকে

সমাজের বৃহত্তর আঙিনায় নারীর কোন ভূমিকার অবকাশ ছিল না বলেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মেয়েদের শিক্ষাকে বাহুল্য জ্ঞান করেছিল। বিদ্যা ব্যক্তিকে জগৎ ও জীবনের প্রতি উৎসুক , কৌতূহলী করে, তার স্বাধীন চিন্তা-চেতনার প্রসার ঘটায়। দৃষ্টিকে সংকীর্ণ সীমার বাইরে দিগন্ত বিস্তৃত করে - সম্ভবত সেজন্যই সচেতন ভাবে পিতৃতন্ত্র নারীর জন্য বিদ্যাচর্চা নিষিদ্ধ করেছিল। কেননা, যে-সমাজে নারী একান্তভাবেই পরাধীন , যাকে সারাজীবন কাটাতে হবে চার দেওয়ালের লক্ষণরেখায়, পরিবারে সন্তান ধারণ, পালন আর উদয়াস্ত পরিশ্রমে যার নিরবকাশ জীবন কাটবে দাসীর মতন- জ্ঞানের আলোক তার সেই পোষমানা , গণ্ডীবদ্ধ গৃহজীবনের প্রশ্নহীন স্থিরতাকে বিড়ম্বিত করতে পারে। উনিশ শতকের আলোকিতা এক নারী কৈলাসবাসিনী গুপ্তার চোখে ধরা পড়ে গিয়েছিল পুরুষতন্ত্রের এই সুবিধাবাদী, স্বার্থপর অভিসন্ধি। ' হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি ' পুস্তিকায় এদেশীয় নারীর বিদ্যাহীনতার সঠিক কারণটি চিহ্নিত করে তিনি লিখেছেন -- "পত্নী পতির অর্দ্ধ অঙ্গস্বরূপ এবং সুখ দুঃখের সমভাগী, কিন্তু ভারতবর্ষীয়েরা সেই শাস্ত্রোক্ত বাক্যের অর্দ্ধেক প্রতিপালন ও অপরার্দ্ধেক পরিত্যাগ করিতেন অর্থাৎ দুঃখের অংশটি বিলক্ষণ রূপে প্রদান করিতেন কিন্তু সুখের অংশটি দিতে অতিশয় কাতর হইতেন, নচেৎ স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিবেন কেন? তাঁহারা বণিতাগণকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্বে রাখিবার অভিপ্রায়েই তাহাদিগকে বিদ্যারসের সুধাময় মাধুর্য্য আস্বাদন করাইতে ইচ্ছা করিতেন না অথবা পাছে তাহারা বিদ্যা বলে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া পুরুষগণকে অগ্রাহ্য করে কিংবা গৃহকার্যে উপেক্ষা করতঃ কেবল শাস্ত্রালাপেই রত থাকে ও অন্তঃপুর হইতে বহির্গতা হইতে ইচ্ছা করে অথবা পত্রদ্বারা আমন্ত্রণ করতঃ অন্য পুরুষকে বরণ করিতে অভিলাষিণী হয়, এই প্রকার বিবিধ আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া তাহারা স্ত্রী-গণকে নিতান্তই নির্বোধ ও বিদ্যাভ্যাসে অশক্তা বলিয়া নির্দেশ করিতেন।" সুতরাং লেখা পড়া শিখলে নারী বিধবা হয় - মধ্যযুগে এরূপ বিশ্বাস তৈরীতে পুরুষতন্ত্রের সচেতন অভিসন্ধি ক্রিয়াশীল থেকেছে। সে- কালে গৃহজীবনে একান্ত প্রয়োজনীয় সূচীকর্ম (ধর্মমঙ্গলের সুরিক্ষা), চিত্রাঙ্কন কিংবা আলপনা (সুরিক্ষা ও ময়মনসিংহ গীতিকার কাজল রেখা) ইত্যাদির অনুশীলনে নারীর তাই কোন বাধা ছিল না, কিন্তু সাধারণভাবে তার ছিল না সাক্ষরতার অধিকার। আলোচ্য এই কালপর্বে নারীর জীবন ছিল বহুলাংশেই জ্ঞানের আলোক বর্জিত, সংকীর্ণ, কুসংস্কারছন্ন। অথচ সন্দেহ কি আমাদের প্রপিতামহী, প্রমাতামহী, অথবা তাঁদের মা, ঠাকুমা, দিদিমারা, যাঁরা পিটুলি গোলা দিয়ে নিকোনো দাওয়ায়-দেওয়ালে এমন সুন্দর আলপনা দিতে পারতেন, বিচিত্র বড়ি দিতে জানতেন, উৎসব অনুষ্ঠানে হরেকরকম পিঠে তৈরী করতেন, কাপড়ে ফোড় তুলে তৈরী করতে পারতেন নকশি কাঁথা সঠিক সুযোগ পেলে উপযুক্ত শিক্ষার গুণে তাঁরাও হয়ে উঠতে পারতেন বিদুষী।

।।৯।। তবু, সেদিনের উজ্জ্বল ব্যতিক্রমগুলির সাক্ষ্য নিয়েই কোনো ঐতিহাসিককে বলতে শোনা গেছে -- "Thus we see plainly enough that the women of the age were not universally steeped in the darkness of ignorance .... in the distant corners of the villages there flourished female poets and writers, who can be regareded as worthy predecessors of their more educated sisters of the present day... it was under tutors, employed by their parents at home , that the girls received their education, which aimed chiefly at equipping them with the knowledge and materials necessary for an honest and happy domestic life in the world". সমালোচকের এই উচ্ছ্বাসের মধ্যেও এই নির্মম সত্য অস্বীকৃত হয়নি যে, সে-কালের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ, পরিবার এই শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে নারীকে সর্বতোভাবে গৃহজীবনের উপযুক্তই করে তুলতে চেয়েছিল। সেই শিক্ষাকে সম্বল করে নারী স্বাশ্রয়ী কিংবা বিশুদ্ধ জ্ঞান তপস্বিনী হয়ে উঠুক , এ অভিপ্রায় কোথাও ছিল না। কেবল মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের ভক্তি-আন্দোলনে সঞ্জীবিত বৈষ্ণব সমাজই নারীর বিদ্যার্জনের কথা দরদ দিয়ে ভেবেছিল। মধ্যযুগে বৈষ্ণব সমাজই ছিল নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সার্বজনিক শিক্ষিত সমাজ। শিক্ষা-জগতে বৈষ্ণব নারীর উত্থান ও অবদান - বিষয়ের গুরুত্বেই আলোচনার পৃথক এক পরিসর দাবি করে। কিন্তু তার বাইরে সেকালের বৃহত্তর পুরুষ প্রাধান্যময় হিন্দু সমাজে পুরুষের কাছে নারীর এই বিদ্যাচর্চার বাস্তব গুরুত্বই বা কেমন ছিল তা লক্ষ্য করা যেতে পারে। গদামালিকা সম্বাদ -এর মল্লিকা কিংবা বিদ্যাসুন্দর কাব্যের বিদ্যা বিদ্যাগুল্কা হবার কথা ভাবতে পেরেছিল খানিকটা তাদের আভিজাত্যের গৌরবে, খানিকটা কবির অপূর্ববস্তুনির্মাণ ক্ষমাপ্রজ্ঞায়। বাস্তবে 'বঙ্গালী বালাই' কবলিত শিক্ষিত নারীর কপালে যে বিদ্বান , রুচিবান স্বামী জোটা বিরল দৈব-সংঘটন ছিল তা বেশ বোঝা যায় ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' এর 'পতিনিন্দায়' এক কাব্য-কুশলী নারীর এই আক্ষেপে "সাধ করি শিখিলাম কাব্যরস কত। কালার কপালে পড়ি সব হইল হত"। সন্দেহ হয়, রসিক নারীর মুখে উচ্চারিত স্বামী পুরুষটির বধিরতা কি আক্ষরিকভাবেই জীবনসঙ্গীর শ্রবণ-দুর্যোগ; নাকি কপাল- বৈগুণ্যে শিক্ষিতা রমণীর স্বামীর বিদ্যাহীনতা , মূর্খতা। তাছাড়া যেখানে স্বামীটি বধির নন , সেখানেও তো স্ত্রীর শিক্ষা কদর পায় না স্বামীর কাছে। বরং পুরুষের মিথ্যা পৌরুষের প্রতাপে, যেন স্বেচ্ছা-বধিরত্বে প্রত্যাখ্যাত হয়ে একরকম ব্যর্থ হয়ে যায়। এ বিষয়েও সেকালের সাহিত্য থেকে একটি উদাহরণ দিই। 'ময়নামতীর গান'বা 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যে গোবিন্দচন্দ্রের মা ময়নামতী ছিলেন মহাজ্ঞানের অধিকারী। স্বামী রাজা মানিকচন্দ্রের প্রাণসংশয় আছে জেনে তিনি তাঁকে সেই 'মহাজ্ঞান' শিখিয়ে দিতে চাইলে রাজা মানিকচন্দ্র বলেন-- "স্ত্রী কে গুরু বলে তার কাছে মাথা হেঁট করার চাইতেপুরুষের আর

কি অধিক অবনতি হতে পারে? আমি তোমাকে কিছুতেই গুরু বলে স্বীকার করতে পারব না"। সুতরাং, মধ্যযুগীয় বাংলায় হিন্দু রমণীর বিদ্যাচর্চার এই ছিল অন্যতম পরিণাম।

সহায়ক গ্রন্থ

১) সনৎকুমার নস্কর- 'মুঘল যুগের বাংলা সাহিত্য'

২) সুকুমারী ভট্টাচার্য-- 'প্রাচীন ভারত ঃ সমাজ ও সাহিত্য'

৩) জয়িতা দত্ত-- সমকালের প্রেক্ষাপটে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য

৪) আহমদ শরীফ - মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ

৫) দীনেশচন্দ্র সেন-- 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'

৬) কনক মুখোপাধ্যায়-- 'বাংলা কাব্যে নারীত্বের রূপায়ণ'

কথাসাহিত্যে চরিত্র ঃ বিম্ব-প্রতিবিম্ব

উত্তম পুরকাইত
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পাঁচ বছরের বিল্টু ঘুসি পাকাচ্ছে। বাইরের ঘুসিটা আয়নার কাচ স্পর্শ করেছে যখন তখন ভেতর থেকে একটা ঘুসি এসে পরস্পরের সঙ্গে মিশছে। মাঝখানে স্বচ্ছ কাচের ব্যবধান। বিল্টু জানে এটা ওর একটা খেলা। এত জোর আঘাত করা যাবে না যাতে কাচটা ভাঙার বীরত্ব দেখাতে গিয়ে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যায়। কিন্তু কাচের ভেতরের বিম্বিত ঘুসিটা ওকে উত্যক্ত করছে। ওই ঘুসিটাই ওর কাছে এখন লীলা, আনন্দ। ও হয়তো এটাও জানে বিম্বিত হাতের মুঠোটাও ওর। তাই রূপকথার বোকা সিংহের মতো আলপটকা ঝাঁপিয়ে পড়ার ঝুঁকিও নেয় না। বরং বারবার মুঠোর ধরনগুলো বদলে বদলে আয়নায় ভঙ্গিগুলোকে উপভোগ করছে। বোধহয় কথাসাহিত্যিকরাও এভাবে নিজেরই বিম্বিত ছবিগুলোর সঙ্গে খেলা করেন। গল্প উপন্যাসের পাতায় ঘুরে বেড়ানো চরিত্রেরা লেখকেরই অভিজ্ঞতা ও ভিন্ন ভিন্ন মনোভঙ্গির ছায়া মাত্র। ছায়া বা কৃত্রিম কিন্তু দেশ কালের পটভূমিকায় গড়ে ওঠা শিল্পিত নির্মাণ। বাস্তবিক যে চরিত্রগুলি অবলম্বন করে লেখক আখ্যান রচনা করেন সেগুলি উপন্যাস বা গল্পে বিম্বিত হবার আগে লেখকের চেতনে, অবচেতনে একান্ত নিজের আত্মচিন্তার অঙ্গ হয়ে যায়। সেই একান্ত নিজের চরিত্রগুলিই অভিজ্ঞতা ও কল্পনায় পরিপূর্ণতা পেয়ে জীবন্ত সত্তা নিয়ে আখ্যানে ফুটে ওঠে। এভাবে বুঝতে গেলে মনে হয় লেখকদের দ্বারা নির্মিত চরিত্রগুলির প্রকৃত কোনো ইন্‌ডিভিচ্যুয়ালিটি নেই। লেখক নিজেই বহুরূপী সাজে রচনায় রচনায় ঘুরে বেড়ান। চারপাশে অগণিত মানুষের তরঙ্গ-সংক্ষুব্ধ স্রোত কেবল দূরে দাঁড়িয়ে দর্শকের মতো সেই শোভাযাত্রা দেখে কথাসাহিত্যিক তৃপ্তি পান না, তিনি সেই স্রোতপ্রবাহে মিশে যান। যখন নির্মাণ করতে বসেন তখন শুধু অবয়বটাই থাকে বাকিটা ভরে যায় লেখকের নিজেরই তৈরি করা ভাবনায়। ব্রহ্মের জগৎ সৃষ্ঠির মতো স্রষ্টাও বিরাজ করেন তাঁর সৃষ্টির মূল কেন্দ্রে।

কথক প্রথমত নিজের আইডিয়াকেই রূপ দেন। প্রাচীন পৌরাণিক কথকেরা তাঁদের আইডিয়া অনুসারে দেবতার বহুবিচিত্র রূপ রচনা করেছেন। দেবকাহিনির ছায়ায় নিজের নিজের অভিজ্ঞতা অনুসারে দেবতাদের দৈহিক, মানসিক গঠন, পারিবারিক, সামাজিক সম্পর্ক, ক্রোধ, কাম, প্রেম ভালোবাসা ইত্যাদির চিত্র এঁকেছেন। সমস্ত দেবচরিত্রই কথকদের সৃষ্টি, সেই সৃষ্টির কেন্দ্রে আছে কথকের নিজস্বতা, তাঁর ভাবনা ও কল্পনা। তাই একজন স্রষ্টার দেবোপাখ্যানের সঙ্গে অপর স্রষ্টার দেবোপাখ্যানে

শুধু আখ্যানগত নয়, চরিত্র নির্মাণেও পার্থক্য ঘটে। ভাবলে অবাক লাগে ঈশ্বরে
যে এত প্রকার রূপবৈচিত্র্য তা তো আসলে কথকদের অত্যাশ্চর্য সৃষ্টিক
দেশকালের পটভূমিকায় প্রকৃতি ও মানব সভ্যতাকে অভিজ্ঞতায় নিজেদের মতো
নিয়ে তবেই তো তাদের এত বিচিত্র রূপকল্পনা সম্ভব হয়েছে। সূর্য্য, অগ্নি, ইন্দ্র,
প্রমুখ দেবতারা ভিন্ন ভিন্ন নামে সব দেশের মিথোলজিতেই স্থান পেয়েছেন। প্রকৃ
অসীমতা, রহস্য, সৌন্দর্য, ভয়ংকরতা, জঙ্গমতা, শক্তি, প্রাচুর্য থেকে যখন যে
কথকরা পেয়েছেন তাকেই মানবীয় আকৃতিতে রূপদান করেছেন। প্রকৃতির প্রা
সম্মান জানাতেই তার স্তুতি, প্রশংসা, বিবরণ ও মূর্তিকল্পনা। মূর্তিগুলি আকৃ
মানুষেরই স্বগোত্রীয়। এর অতিরিক্ত কোনো কল্পনা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। অ
অরণ্যচারী বনবাসী মানুষের শিকারের অভিজ্ঞতা দেবতার হাতে বর্শা, তীর, ধনু,
গদা, কাতান, চক্র ইত্যাদি তুলে দিয়েছে। দেবতাদের বাহনেরাও আদি বনবাসী মানু
অনুচর মাত্র। যাযাবর মানুষ সমাজ পরিবার গঠনে নিয়ন্ত্রণ এনেছে, সম্পর্কগুলো
ইতি বা নেতিতে বিন্যস্ত করেছে, মানবিক সম্পর্কের বিকাশ ঘটেছে কোমল
অনুভবগুলির রীতিমতো চর্চার দ্বারা - কথকরা এই জীবনবৃত্তে আবর্তন করতে
যখন যে ধরনের thought কে খুঁজে পেয়েছেন তখন সেইমতো করেই দেবতা
বিবরণ, মূর্তি ও আখ্যান রচনা করেছেন। তারপর রাজতন্ত্র, রাষ্ট্রনীতি, অর্থ
সমাজনীতি, বাণিজ্যনীতি, রাজনীতি একে একে সব শিক্ষাই পেল দেবতারা। কথক
এই সৃষ্টি করার দক্ষতাকে সম্মান জানাতেই ভারতীয় বৈদিক সমাজে তাঁদের বলা হ
ঋষি। 'অপারে কাব্য সংসারে কবিরেক প্রজাপতি।' - তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মার ম
জগৎ সৃষ্টিতে সক্ষম। আধুনিক কালের কথাসাহিত্য অর্থাৎ গল্প, উপন্যাস
মানবচিন্তার ফসল; একজন স্রষ্টা একটি মাত্র আখ্যান বা স্বল্প কয়েকটি চরিত্র রচনা
ক্ষান্ত হন না; এই বহুমাত্রিক চিত্রশালাকে দেখে মনে হতে পারে কথকদের
চরিত্রগুলি অনেকখানি স্বাধীন, লেখক নিজেও তাঁদের স্বাধীনতা দানে আগ্রহী, লেখ
ভূমিকা বুঝি বহুলাংশে দর্শকের - বাস্তবিক তা হয় না। লেখক কেবল দর্শক
একালের চাকুরিপ্রিয় লেখক-সাংবাদিক হওয়া সম্ভব, কথাসাহিত্যিক হয়ে ওঠা স
নয়।

উপন্যাসের চরিত্র রক্তমাংসে গড়া প্রকৃতির সৃষ্টি নয় - বাস্তবিক মানুষ তারা
হলেও মানুষের মতো, মানুষের স্বভাব-ধর্মই সর্বাঙ্গে মুদ্রিত কিন্তু প্রকৃতি যেভাবে প্রতি
মানুষকে স্বাধীন চিন্তা স্বাধীন মনোবৃত্তি দিয়েছে কথকের সৃষ্ট চরিত্র সেই স্বাধীন
কোথায় পাবে, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষে সে তো কথকের মনোজগৎ ও ভাবনার দ্বা
পরিচালিত। বহমান সভ্যতার সজীব মানুষেরা প্রত্যেকেই ইনডিভিচ্যুয়াল, তাদের ব্যি

স্বতন্ত্রতা কথকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিন্তু কথকদের মনোজগতেরও ভিন্নতা আছে, সে ভিন্নতা অভিজ্ঞতা, প্রকৃতি ও প্রতিভাগত। একজন কথক সচেতন প্রচেষ্টাতেও হুবহু আর একজন কথকের মতো লিখতে পারেন না। জেলে পাড়ার জীবন জীবিকা নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'র মতো উপন্যাস থাকা সত্ত্বেও আবার এ ধরনের উপন্যাস অদ্বৈত মল্লবর্মণ কেন লিখলেন - এই প্রশ্নে অদ্বৈতের উত্তর ছিল - "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মাস্টার আর্টিস্ট কিন্তু বাওনের পোলা রোমান্টিক, আমি জাওলার পোলা।" মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুবের ও কপিলা অদ্বৈতের কিশোর ও বাসন্তী একই ধরনের চরিত্র হলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন তাঁর নিজের আইডিয়াকে, অদ্বৈতের জীবন সম্পর্কিত আইডিয়া ভিন্ন। তারাশঙ্কর গান্ধীবাদী বা গান্ধীজীর রাজনৈতিক ভাবনায় বিশ্বাসী, তবুও 'কালিন্দী' উপন্যাসের নায়ক অহীন্দ্র যখন রাত জেগে মার্কসীয় তত্ত্ব পড়তে পড়তে জানালা দিয়ে চর ছেড়ে যাওয়া সাঁওতালদের দেখে তত্ত্ব ও অভিজ্ঞতাকে মিলেমিশে যেতে দেখার আনন্দ পায় তখন বোঝা যায় এই উপলব্ধি অহীন্দ্র নামক কোনো কাল্পনিক চরিত্রের নয়, কথকের বা ঔপন্যাসিকের নিজের।

আসলে অন্য সমস্ত শিল্পের মতো কথাসাহিত্যেও চরিত্র একটি নির্মাণ। শিল্পীর নির্মাণ শিল্পীর অভিজ্ঞতা ও মর্জিসাপেক্ষ। চিত্রশিল্পীরা যখন গাছ, বা মানুষ আঁকেন তখন তাঁরা ওগুলির অবয়বটাকেই নেন। আঁকেন কেবল নিজেদের ভাবনা। তবে শিল্পীর আঁকা ছবি কখনো শিল্পীকে চমকে দিতে পারে, ঔপন্যাসিকের আঁকা চরিত্রও ঔপন্যাসিককে। সৃষ্টির আনন্দজনিত বিস্ময় থেকে বাল্মীকির মতো বলে উঠতে পারেন - 'কি মিদং ব্যহৃত্য ময়া।' বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেলে বোঝা যায় অভিজ্ঞতা ও তার ভাবনার রসায়ন অলক্ষ্যে কথকের মনে প্রস্তুত ছিল বলেই এমন চরিত্র অঙ্কন সম্ভব হয়েছে। চিন্তাসূত্রকে ক্রমপরম্পরায় সঞ্চিত করলে স্পষ্ট হবে রামায়ণের ওই রাবণ ও রামচন্দ্র বাল্মীকির রত্নাকর (দস্যু) ও ঋষি (শিক্ষিত) দুই সত্তার মিলিত রূপ। রামায়ণের আখ্যানের সূচনাতে সেই ইঙ্গিতও আছে। রামচন্দ্রের সভায় দুই বালক এসে শোনাচ্ছেন রাবণ নিধন করে রামচন্দ্রের রাজ্য স্থাপনের আখ্যান। দস্যুবৃত্তিকে নিধন করতে না পারলে সর্বগুণ সম্পন্ন 'নরচন্দ্রমা' রাম কীভাবে মানুষের রাজ্যে নিজেকে শ্রেষ্ঠরূপে প্রতিষ্ঠা করবেন। এই সমস্ত নিধন প্রক্রিয়াটি আখ্যানে ফুটে ওঠার আগে ঘটে গেছে কথক বাল্মীকির ভাবনায়। বাল্মীকির পরিচয় সংক্রান্ত কিংবদন্তী জড়িত আখ্যানটিকেও নতুন করে পাঠ করলে বোঝা যাবে আদি কবির কল্পিত চরিত্রেরা তাঁর অভিজ্ঞতা ও লব্ধ জ্ঞানের রূপক মাত্র। নারদের সঙ্গে দস্যু রত্নাকরের কথোপকথনে নারদের প্রশ্ন - তিনি (রত্নাকর) এই মহা পাপকার্য করেন কেন?' রত্নাকরের স্পষ্ট উত্তর - "পিতামাতা ও স্ত্রী-পুত্রাদি প্রতিপালনের জন্য।" নারদের পরবর্তী প্রশ্ন - 'তাঁর (রত্নাকরের) পিতামাতা

ও স্ত্রী-পুত্রগণ এই পাপের ভাগ গ্রহণ করবেন কি না?' রত্নাকর উত্তর দেন, 'অবশ্য
করবেন।' কিন্তু গৃহে ফিরে রত্নাকর প্রত্যেকের কাছে প্রশ্ন করে জানেন, কেউ
পাপের ভাগ নেবেন না, তখন রত্নাকরের চৈতন্যোদয় হয়। সভ্যতার আদিপর্বে
কেন আধুনিক কালেও দস্যুবৃত্তির দ্বারা সংসার প্রতিপালন কোনো অবাস্তব, অস
অতিলৌকিক ব্যাপার নয়। কিন্তু পাপবোধ ও চৈতন্যোদয় এসব অভিজ্ঞতা
লব্ধজ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আইডিয়া, তার জন্য সভ্যতার আরও খানিকটা বিকা
আভিজ্ঞতা ও সময়ের ব্যবধান প্রয়োজন। দীর্ঘ তপস্যা সেই অবসর দিয়ে
বাল্মীকিকে। এককথায় বাল্মীকির এই জীবন বৃত্তান্ত আদি কথাকারের ইতিহাস
জ্ঞানের পরিচয়। এই জ্ঞান বাল্মীকির অন্তরে সঞ্চিত ছিল বলেই তিনি রামায়ণের বি
পটভূমিকায় অরণ্যচারী রাবণের দস্যুপনা, সীতালুণ্ঠনের মতো পাপাচারের পরা
দেখিয়ে বিবর্তিত রাজতন্ত্রের আদর্শ পাঠককুলের কাছে উপস্থাপন করেছেন রামচন্দ্র
মতো এক সর্বগুণময় চরিত্র, অবশ্যই তা কাল্পনিক - তাকে সামনে রেখে।

পুরাণ ও মহাভারত রচয়িতা ব্যাসের জীবন সম্পর্কিত আখ্যানটিও এ প্রস
তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যাস নিজেই কথক ব্যাসের হাতে কল্পিত। ধীবর জননী ও ব্রাহ্মণ পি
পুত্র-ব্যাস। ব্যাসের জন্ম আখ্যান প্রাচীন ভারতীয় সমাজের বিশেষ কালের স
আধিপত্যের প্রতীক, যেন অকথিত-ইতিহাস কাল্পনিক আখ্যানের ছলে বলে চলে
কথক আর লেখেন গণেশ। কথক ব্যাস রচয়িতা হিসাবে এতটাই নিরপেক্ষ
স্বাধীনসত্তা যে সর্বকালের কথাকারদের কাছে তাঁর আত্মপরিচয় শিক্ষণীয়। নি
কু-কীর্তির কথাও কখনো গোপন করেননি। তিনি কথক, কথাকার, সত্য সন্ধা
অলিখিত ইতিহাসের ধারক। তিনি অবলীলায় বলে চলেন - পিতা মুনি পরাশর ধী
কন্যা মৎস্যগন্ধাকে সঙ্গম ইচ্ছায় আহ্বান জানালে দিবালোকে মৎস্যগন্ধা সঙ্গ
অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। অতঃপর পরাশর কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করেন, মৎস্যগন্ধাকে জা
তিনি মৎস্যগন্ধাকে সুগন্ধাযুক্ত করবেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গমের ফলে মৎস্যগন্ধার কুমা
দূষিত হবে না। এইভাবেই পরাশর ও মৎস্যগন্ধা মিলিত হলে ব্যাস জন্মগ্রহণ করে
পরে মৎস্যগন্ধা হন সত্যবতী, শান্তনু রাজার স্ত্রী। তাঁদের প্রথম পুত্র অঙ্গদ অল্প বয়
মারা যান, দ্বিতীয় পুত্র বিচিত্রবীর্যও নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে সত্যবতী ব্যাস
আহবান জানান দুই পুত্রবধু অম্বিকা ও অম্বালিকাকে গ্রহণ করার জন্য। মাতার আদে
ব্যাস ভ্রাতৃবধুদ্বয়ের সঙ্গে, এমনকি ভীত অম্বিকা সত্যবতীর আদেশ দ্বিতীয়বার পাল
অক্ষম হয়ে এক দাসীকে প্রেরণ করলেও ব্যাস সকলের সঙ্গে মিলিত হন। এভা
অম্বিকাপুত্র ধৃতরাষ্ট্র, অম্বালিকার পুত্র পাণ্ডু এবং ওই দাসীর পুত্র বিদুর জন্মলাভ করে
এসব আখ্যান রচনায় ব্যাস সাহসিকতা ও সমাজজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে

মহাভারতের সমস্ত আখ্যান ও চরিত্রগুলির সঙ্গে এভাবে ব্যাস নিজের জীবন ও অভিজ্ঞতাকে একাকার করে দিয়েছেন। সমগ্র প্রাচীন ভারতে তার মতো কথাকার আর কেউ নেই। তাঁর রচিত মহাভারতের শ্রেষ্ঠ চরিত্র তিনি নিজেই, পাণ্ডব ও কৌরব বিবাদমান উভয় পক্ষের রক্তসঞ্চালনের মধ্যে তিনি মিশে আছেন। সেই মহান যুদ্ধের বাস্তবিক অস্তিত্ব ইতিহাসে অনুসন্ধান করা বৃথা যেমন রামের জন্মভূমি অযোধ্যা, যুদ্ধক্ষেত্র লঙ্কাপুরীও ইতিহাস নয় - কবি কল্পিত; এ সমস্তই সংঘটিত হয়েছিল কবি বাল্মীকি বা ব্যাসের অন্তরলোকে; দেশকালের অভিজ্ঞতা ভাবনা-দুর্ভাবনা থেকেই এই যুদ্ধের আইডিয়া, যা প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাঁদের আখ্যানে। সমগ্র এশিয়া মাইনর জুড়ে যত আখ্যান ও চরিত্র রচিত হয়েছে তা কোনো একজন স্রষ্টার সৃষ্টি নয়, সভ্যতার চলমান ইতিহাসে কথকদের সমস্ত অভিজ্ঞতালব্ধ সৃষ্টি রামায়ণ ও মহাভারতের ছত্রছায়ায় ঠাঁই পেয়েছে। সেই দুই সুবিশাল, রাজ-প্রাসাদের শিখরদেশে যত প্রহরী আছে, সদর দরজায় যে সব দ্বার রক্ষী আছে, প্রাসাদের অভ্যন্তরে সিংহাসনে সপারিষদ যারা বসে আছেন, অন্দরমহলে যেসব রাজমহিষী ও দাসদাসী আছেন, সুবিশাল সৈন্যবাহিনী, পরিচালক ও নগরবাসী এরা সকলেই আখ্যানে স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করলেও তারা বাস্তবিক স্বাধীন, সত্য নয়। তারা তাদের কথকদের অভিজ্ঞতা ও কল্পনার প্রতিমূর্তি মাত্র। কথকরা নিজের কথাই লিখে চলেছেন শিল্পের আয়নায় কল্পিত মূর্তিগুলিকে সামনে রেখে।

কথাসাহিত্যে চরিত্র নির্মাণ কথাকারের জীবনভাবনা সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন এক্সপেরিমেন্ট। বাস্তবিক কোনো একটি চরিত্র কথাকারের জীবনভাবনাকে প্রভাবিত করতে পারে কিন্তু সে তো অসম্পূর্ণ। তাকে পরিপূর্ণতা দিতে গেলে তো তার দাস হলে চলে না। চরিত্রটি নিজেও তো এক পায়ে দাঁড়িয়ে নেই। পারিপার্শ্বিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করলে তার অসম্পূর্ণতা প্রকট হয়ে পড়বে। কথাকার তাঁর ন্যারেটিভের নির্মাণের দ্বারা চরিত্রটিকে উপস্থাপনার যথোপযুক্ত একটি ক্যানভাস গড়ে তোলেন। এই ন্যারেটিভের নির্মাণেও লেখক যে সর্বদা বাস্তববাদী ভূমিকা পালন করতে পারেন তা নয়। জীবনভাবনার যে দ্বন্দ্বময় দিকটি বা রহস্যময়তার দিকটি কথাকারকে রচনায় প্রবৃত্ত করেছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে তার দাবিকে মানতে গিয়েই কথাকার বাস্তবিক চরিত্রটির ইনডিভিজুয়ালিটিকে ভাঙেন, ন্যারেটিভের বাস্তবতাকেও ভেঙে ফেলেন। এমনকি আত্মচরিত বা আত্মজৈবনিক গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রেও লেখক তাঁর ব্যক্তিমানুষটিকে ভেঙে ফেলে তাকে নতুন রূপে দেশকালের প্রতীক প্রতিনিধি করে তোলেন। হয়তো লেখক রূপে আত্মপ্রকাশের কালে অধিকাংশ কথাকারের ছদ্মনাম গ্রহণের এটাও একটা কারণ হতে পারে। অন্য চরিত্রকে নির্মাণের আগে লেখক যাকে সব থেকে নিবিড় চোখে দেখেছেন, যার সঙ্গে তাঁর প্রতিটি মুহূর্তের চেনাজানা সেই নিজেকেই আইডিয়া ও

কল্পনার ছাঁচে পরিপূর্ণতা দানের কাজটা সেরে ফেলেন। নিজেকে দিয়েই কথাকারে চরিত্র নির্মাণের সূচনা। আত্মকথায় বাণভট্ট ঠিক এই কথাটাই যেন পাঠককে বোঝাতে চেয়েছেন নিজেকে দিয়ে। দক্ষভট্টের বাণভট্ট হয়ে ওঠা প্রসঙ্গে লেখেন - "যদি বাণভট্ট নামেই আমার পরিচয়, কিন্তু ইহা আমার বাস্তবিক নাম নয়। এই নামের ইতিহাস যদি লোকে না জানিত তাহা হইলে ভালো হইত। আমি চেষ্টা করিয়া লোককে ইহা ইতিহাস বিষয়ে অনভিজ্ঞ রাখিতে চাহিয়াছি; কিন্তু নানা কারণে এখনও ঐ ইতিহাস আর বেশি লুকাইতে পারি নাই। জন্ম হইতে লক্ষ্যহীন, গল্প প্রিয়, অস্থির চিত্ত ও নিদ্রালু। আমি যখন ঘর হইতে পলাইয়াছিলাম, তখন নিজের সঙ্গে গ্রামের অনেক কিশোরকেও গাঁথিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। তাহারা শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে থাকিল না। তাহা হইলেও গ্রামে আমার বদনাম তো থাকিয়াই গেল। মগদের ভাষায় লেজ কাটা বলদকে বলে 'বণ্ড'। সে দেশে ইহা প্রবাদের মধ্যে চলিয়া গিয়েছে যে 'বণ্ড নিজে নিজে গিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে না হাতের দড়িটাও লইয়া গিয়াছে।' তাই লোকে আমাকে 'বণ্ড' বলিতে লাগিল। তাহারপরে সংস্কৃত শব্দ 'বাণ' দিয়া সংস্কার করিয়া আমি এই নামের মান কিছু বাড়াইয়াছি। 'ভট্ট' কথাটা তো লোকে আরও কিছু পরে জুড়িয়া দিয়াছিল। না হইলে আমার নাম ছিল দক্ষ।" - দক্ষ নামটিকে গোপন রাখার চেষ্টা এবং 'বণ্ড' শব্দটিকে সংস্কার 'বাণ' শব্দের দ্বারা সংস্কার করে নেওয়া লেখক পরিণত শিল্পী। কথক তাঁর নিজের জীবনকেও সংস্কার করেছেন, নির্মাণ করেছেন অভিজ্ঞতা ও আইডিয়ার দ্বারা। সমাজে এমন বাউন্ডুলে, ভবঘুরে 'বণ্ড' অনেকেই আছে, কিন্তু তাদের ক'জন কথক, শিল্পী ক'জন বাণভট্ট হতে পেরেছেন। কথাকারকে বর্ণনার তুলিতে আগে তো একটা ক্যানভাস আঁকতেই হয়। সব সময় তা যে খুব সচেতনভাবে করেন তা নয়। লেখকের অভিজ্ঞতা ও কল্পনা অনায়াস দক্ষতায় তা লিখে চলে। সেই ক্যানভাসে যে চরিত্রেরা এসে দাঁড়ায় তারা লেখকের দেখা বাস্তব চরিত্রগুলির অবয়ব। দক্ষ শিল্পী এদের যে কারুকে নিয়েই একটি সর্ম্পূণ চরিত্র আঁকতে পারেন। অঙ্কিত চরিত্রটি কী ধরনের সর্ম্পূণতা পাবে তা নির্ভর করবে শিল্পীর জীবন সম্পর্কিত ভাবনার উপরেই। পাঠকের মনে হতে পারে কথাসাহিত্যের প্রত্যেকটি চরিত্রই স্বতন্ত্র, স্বাধীন কিন্তু লেখক দাবি করবেন এরা সকলেই আমার সৃষ্টি। প্রসঙ্গত বাণভট্টের আত্মকথার আরও একটি অংশ উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করা যাচ্ছে না, যদিও এসব অতি প্রাচীন নমুনা, তবু আধুনিক যে-কোনো আত্মজৈবনিক উপন্যাসের সঙ্গে রচনাটির তুলনা করা চলে। যাই হোক - "সারা জীবন আমি (বাণভট্ট) স্ত্রীলোকের শরীর কোনো অজ্ঞাত দেবতার মন্দির বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছি। আজ লোকের কথায় ভয়ে সেই মন্দিরকে আবর্জনাময় রাখিয়া যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম - 'নিপুনিকা তুমি কে চলিয়া আসিলে, এ পর্যন্ত কোথায় ছিলে, এখন কি করিতেছ? আমি তোমাকে দুই

দেখিতেছি। তোমাকে এই অবস্থায় রাখিয়া আমি এখন এখান হইতে নড়িতে পারি না। ভট্ট, কোন কথার জন্য তুমি পলাইয়া আসিয়াছিলে? আজ ছয় বৎসর ধরিয়া আমার মন অনবরত তোমাকে ধিক্কার দিতেছে; এখন মনে হইতেছে যে আমিই বুঝি তোমার সমস্ত দুঃখের মূল। একবার তুমি নিজের মুখে বল যে সেকথা ভুল। আমি কি নির্দোষ?'

নিপুণিকা দীর্ঘনিশ্বাস লইয়া বলিল, - হাঁ ভট্ট, আমার পলাইয়া আসিবার কারণ তুমিই, কিন্তু তোমার দোষ নয় - আমারই দোষ। তোমার উপর আমার মোহ ছিল। ঐ অভিনয়ের রাত্রে আমার ক্ষণেকের জন্য মনে হইয়াছিল যে আমার জয় হইবেই; কিন্তু পরমুহূর্তেই তুমি আমার আশাভরসা চূর্ণ করিয়া দিলে। নিষ্ঠুর, তুমি অনেকবার বলিয়াছে যে তুমি নারীদেহকে দৈবমন্দিরের সমান পবিত্র মনে কর; কিন্তু একবারও কি ভাবিয়া দেখিয়াছ যে এই মন্দির হাড় মাংসের, ইট চুনের নহে। যে মুহূর্তে আমি সর্বস্ব লইয়া এই আশায় তোমার দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম যে তুমি তাহা গ্রহণ করিবে, সেই সময়েই তুমি আমার আশা ধূলিসাৎ করিয়া দিলে। সেদিন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে তুমি জড় পাষাণ পিণ্ড; তোমার ভিতরে না আছে দেবতা, না পশু, আছে এক অলংঘনীয় জড়তা আমি এই জন্য সেখানে টিকিতে পারিলাম না।" - যে কোনো জীবনই একটা ডিস্কোর্স রচনা করতে পারে। তা সে লেখকের জীবনই হোক বা লেখকের দেখা জীবনই হোক। কিন্তু ব্যাপারটা ঘটে সেই লেখকের মধ্যে, যাঁর দেখবার চোখ আছে, বৌদ্ধিকবৃত্তি আছে, সৃজনী প্রতিভা আছে কল্পনাশক্তি আছে। বাস্তবের নিপুণিকা যত বাস্তবই হোক যে অভিমান নিপুণিকার মধ্যে দিয়ে পাঠকের কাছে প্রচারিত হল তা নিপুণিকা নয়, বাণভট্ট নামক শিল্পীর। তাঁর জীবনজিজ্ঞাসার উত্তর তিনি খুঁজেছেন নিপুণিকার জীবন্ত মূর্তিটিকে সামনে রেখে।

সঙ্গত কারণেই বাণভট্টের আত্মকথার আলোচনা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত, উপন্যাসের কথাটি এসে যেতে পারে। 'শ্রীকান্ত', ইন্দ্রনাথ, অন্নদা - প্রথম খণ্ডের এই তিনটি চরিত্রের নির্মাণে লেখক যে জীবনসত্যকে ধরতে চেয়েছেন তাই ঘুরে ফিরে এসেছে পরবর্তী চরিত্রগুলির মধ্যে। বাস্তবে ভাগলপুরে বেড়ে ওঠা শরৎ-এর বন্ধু রাজেন্দ্র উপন্যাসে শুধু ইন্দ্রনাথ নামক একটি দুঃসাহসী চরিত্রের মডেলে পরিণত হয়নি, পরিণত শ্রীকান্তের কলম তাকে জীবন বিকাশের একটা সরল প্রাকৃতিক তত্ত্ব বা অভিজ্ঞান করে তুলেছে। যে ধারণার কথা লিখতে গিয়ে লেখক শ্রীকান্ত পাঠকের কাছে প্রশ্নচিহ্নের ভঙ্গিতে জানিয়েছেন - 'মানুষ, দেবতা না পিশাচ কে ও' অথবা অন্নদা দিদির কথায় - "তোমাকে কি আশীর্বাদ করব ভাই, তুমি মানুষের আশীর্বাদের বাইরে।" - একটা অতি জীবন্ত বাস্তবধর্মী চরিত্র অঙ্কনের মধ্যে দিয়ে লেখক জীবনের একটা তত্ত্ব বা ডিসকোর্সকে খাড়া করে দেন। রাজেন্দ্রের অবয়বটাই এখানে আছে, বাকিটা লেখক

শ্রীকান্তের অভিজ্ঞতায় অর্জিত ধারণার নির্মাণ। লেখক শ্রীকান্ত কিশোর শ
শ্রীকান্ত রূপে নির্মাণ করে চলেছেন সমগ্র উপন্যাস জুড়ে। জীবনের অপরাহ্ণ বে
এসে অতীত শ্রীকান্তের কথা লিখতে বসে লেখক দেখেছেন তার সেই ভবঘুরে জীব
সেদিন যেরকম ছি-ছি-তে ভরে গিয়েছিল বাস্তবিক তার জীবন অতটা ছি ছি ছিল না
ভবঘুরে জীবন মানেই ছি ছি নয়, শিক্ষিতকরণের প্রথাসর্বস্ব পারিবারিক শাসনে
গণ্ডীতে বড় হয়ে উঠতে উঠতে অভিজ্ঞতা কীভাবে জীবনকে শিকড়হীন চলমান পথিকে
পরিণত করে, তা না ঘটলে শ্রীকান্তর যে কত কিছুই জানা হত না, তৈরি হত না জীবন
সম্পর্কিত নিজস্ব একটা দর্শন - সেকথাই যেন লেখক শ্রীকান্ত লিখেছেন। এক অর্থে সে
তো নিজেকেই লিখে চলা। বাস্তবের অন্নদা দিদির মুখোমখি হওয়া শ্রীকান্তের এক
বিরলতম অভিজ্ঞতা। কিন্তু অন্নদা দিদির জীবন থেকে লেখক শ্রীকান্ত যে সত্যকে
আবিষ্কার করেছেন- "বোধ হয় স্ত্রী-লোককে আর কখনো ছোট করিয়া
দেখিতেপারিলাম না" -- এ কথা অন্নদা নিজমুখে ঘোষণা করেনি, এই মানুষেরা তা
করেনও না। সমাজের হাতে, ধর্মের হাতে এমন লাঞ্ছিতা পীড়িতা রমণী তো প্রায় সকল
মানুষই দেখে থাকেন, সকলের কাছে তো ওই সত্য আবিষ্কৃত হয় না। এত ঘর ভা
শিক্ষিত নরনারী। এত এত ডিগ্রিধারী তবু সমাজের কতটুকু অংশে আজও স্ত্রীলোককে
তার প্রাপ্য সম্মান দিতে শিখেছে; সেখানে শ্রীকান্ত বাস্তবের অন্নদা দিদির সাক্ষৎ পেয়ে
শুধু তাকেই আঁকেনি, তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে, জীবনের আরও অনেকটা পথ, আরও
অনেক জীবনের সাক্ষাৎ পেয়ে নিজের আবিষ্কৃত সত্যের বারবার পর্যবেক্ষণ পরীক্ষণের
মধ্যে দিয়ে একটা অভিজ্ঞানকেই পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন। সে
অভিজ্ঞানের মধ্যেই ঠাঁই পেয়েছে রাজলক্ষী, অভয়া, কমললতা, সমগ্রভাবে
শরৎ-সাহিত্যের সমস্ত নারী চরিত্র।

কথাকারের চরিত্র নির্মাণ যে সামগ্রিকভাবে নিজেকে, নিজের অভিজ্ঞতাকে
নির্মাণ, রবীন্দ্রনাথের 'মণিহারা' গল্পটির বিষয়বস্তুই যেন তাই। গল্পটি একদিক থেকে
যেমন অতিপ্রাকৃত পরিবেশে মনস্তাত্ত্বিক গল্প অন্যদিকে তেমনি কথাসাহিত্যের
নির্মাণগত কৌশলটিও এ গল্পের বিষয়বস্তুরই অঙ্গস্বরূপ। সচরাচর রবীন্দ্রনাথ তাঁর
অতিপ্রাকৃত বা মনস্তাত্ত্বিক গল্পগুলিতে দুজন বা তিনজন কথককে পাঠকের সামনে
আনেন। এ ধরনের প্রথম গল্প 'কঙ্কাল'-এ প্রথমত গল্প শুরু করেন একজন কথক
উত্তম পুরুষের জবানিতে, তারপর গল্পের কথক হয়ে যায় কঙ্কালটি। মণিহারা গল্প
একজন কথক শুরু করে ফণিভূষণ নামক এক শিক্ষিত ধনীপুরুষের দাম্পত্য জীবনের
ব্যর্থতার কথা দিয়ে। ক্রমে গল্পে উপস্থিত হন ফণিভূষণ। তারপর দেখা যায়
ফণিভূষণকে গল্প শোনাতে এসেছে শীর্ণকায় এক মাষ্টারমশাই। এই কথক মাষ্টারমশাই

নিজের জীবন সম্পর্কিত ধারণাকে কীভাবে ফণিভূষণের জীবনের সঙ্গে একাকার করে দিতে চেয়েছেন তা আমাদের আলোচনার সাপেক্ষে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মাষ্টারমশায়ের গল্পের শেষে জানা যায় ফণিভূষণকে তিনি দেখেননি। এখানে আসার দশ বছর আগে ফণিভূষণ এ বাড়ি ছেড়ে কোথায় চলে গেছেন। তিনি এখানে এসে ফণিভূষণ সম্পর্কে যে কথা শুনেছিলেন তাই শোনাচ্ছিলেন। শোনাচ্ছিলেন আসলে অন্তান্তে ফণিভূষণকে ফনিভূষণেরই গল্প। গল্প শেষে ফণিভূষণের ব্যঙ্গ তার স্ত্রী নাম - 'নৃত্যকালী।' অর্থাৎ মাষ্টারমশাই-এর গল্পের ফণিভূষণ ও মণিমালা যে বাস্তবের ফণিভূষণ ও মণিমালা নয়, মাষ্টারমশাইকে ধরিয়ে দেন গল্পকার। কথক বা লেখকদের এভাবেই চরিত্র নির্মাণ করতে হয়। বস্তুত চরিত্র নির্মাণ তো নয়, জীবন সম্পর্কিত ধারণার নির্মাণ, যে নির্মাণে আখ্যান একটা ছলনা এবং চরিত্র লেখকের ধারণার বাহক মুখপত্র, কখনো বা প্রচারক। গল্পটিতে মাষ্টারমশাই যখন ফণিভূষণকে জানাচ্ছিলেন - স্ত্রীলোকেরা ঝাল লঙ্কা ও কড়া স্বামী পছন্দ করেন তখন ফণিভূষণ শ্রোতা বা পাঠক, তার প্রতিবাদ করেন না কিন্তু শেয়ালেরা হঠাৎ হঠাৎ চিৎকার করে মাষ্টারমশাইকে বাধা দেয়। এ যেন লেখকের বানানোর কৃত্রিমতাকেই উপহাস করা। বস্তুত শিল্পের ব্যাপারে যে কোনো নির্মাণ লেখকের। বাস্তবের ঘটনা বাস্তবের চরিত্র অসত্য, কারণ তা ক্ষণস্থায়ী, অসম্পূর্ণ, তাকে সত্য করে তুলতে পারেন একমাত্র লেখক, লেখকের সৃজনী প্রতিভা - "নারদ কহিল হাসি, সেই সত্য যা রচিবে তুমি,/ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি,/রামের জন্মস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"

নীতিবাগীশ বঙ্কিমচন্দ্রের নীতিবাদ, রক্ষণশীলতা ও তাঁর শিল্পী মনের রোমান্টিকতা অথবা ওই দুই মনোভাবের দ্বন্দ্ব, সমাজতাত্ত্বিক বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের আপাত পরাজয় দেখানো - এসবকেই ভাষা দিয়েছে বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্রেরা। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের কোনো চরিত্রের ভিত্তিই তেমন বাস্তবসম্মত নয়। ইতিহাসের বা ইতিহাসাশ্রিত কাল্পনিক পটভূমিকায় বিচরণ করা চরিত্রেরা তো বটেই সামাজিক উপন্যাসের চরিত্রেরাও কল্পিত বলেই মনে হয়। পতিসেবার আদর্শ দেখানোর জন্য এক ধরনের নারী চরিত্র অঙ্কন এবং বিধবা নারীর সম্মোহনে আদর্শ পুরুষের পতন দেখানোর জন্য বিলাসিনী কয়েকটি নারীকে পাঠকের সামনে তুলে ধরা। একটু সঙ্গত প্রশ্ন করলেই চরিত্রগুলির বাস্তবতা ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়বে। সামাজিক, পারিবারিক উপন্যাসেও নায়ক-নায়িকাদের সন্তান-সন্ততি বিষয়ক কোনো দ্বন্দ্ব নেই বললেই চলে। জীবন দ্বন্দ্বও ভাগ্য নির্ধারিত সুমতি ও কুমতির প্রভাব। লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশাবলী পাঠককে সর্বদা বুঝিয়ে দেয় এই কাহিনি বা চরিত্র সমস্তই লেখকের ধারণার বাহক মাত্র। বঙ্কিম পরবর্তী রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসেও কেন্দ্রীয় চরিত্রেরা সকলেই লেখকের

মনোভাবের বাহক। গোরা, শচীশ, নিখিলেশ চরিত্রগুলিতে রবীন্দ্র কণ্ঠস্বর খুবই স্পষ্ট এমনকি পার্শ্ব বা অপ্রধান চরিত্রেরাও শুধুমাত্র কতকগুলি চরিত্র নয়, তারা প্রত্যেকেই লেখকের ধারণা গড়ে তোলায় ছায়াসঙ্গীর ভূমিকা পালন করে থাকেন। গোরার পাশে বিনয়, শচীশের পাশে শ্রীবিলাস, নিখিলেশের পাশে সন্দীপ ভিন্ন আইডিয়ার ধারক শেষের কবিতার অমিতের ব্যবহারে সংলাপে সমালোচকেরা কল্লোলীয়দের কণ্ঠস্বর শুনতে পান, বর্তমানের বিশিষ্ট রবীন্দ্র সাহিত্যের আলোচক তপোব্রত ঘোষ আবার অমিতকে বিহারীলালের ছায়া বলেই দাবি করেন। কিন্তু অমিতের শিলং পাহাড়ে গিয়ে সুনীতিকুমারের সদ্য প্রকাশিত ভাষাতত্ত্বের বই পড়া, কথায় কথায় আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব উথাপন করা ইত্যাদিকে রবীন্দ্র জীবনীর সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করলে দেখা যাবে অমিত রবীন্দ্রভাবনারই প্রতীক। কল্লোলের বিদ্রোহের সারবত্তাকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে অনুধাবন করা এবং সমকালীন বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব ও আধুনিক বিদেশী কবিদের কাব্যভাবনাকে আত্মস্থ করে রবীন্দ্র চেতনা নবরূপ লাভ করেছিল, অমিত রবীন্দ্র পাঠকদের কাছে সেই বার্তাই পৌঁছে দিয়েছে।

অপুর জীবনদৃষ্টি যে বিভূতিভূষণের এ কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বন্ধু মহলে 'পথের পাঁচালী' কাউকে উপহার দিলে অপু নামেই স্বাক্ষর করতেন। ভবঘুরে কথকতা করে ঘুরে বেড়ানো পিতাই উপন্যাসের হরিহর; দুখিনী হয়েও আত্মসম্মান রক্ষায় তৎপর সর্বজয়া চরিত্রেও বিভূতিভূষণের জননীর ছায়া। তবু যেহেতু উপন্যাস তাই প্রতিটি চরিত্র এমনকি নিজেকেও লেখক বিভূতিভূষণ নির্মাণ করেছেন তাঁর পরিণত আইডিয়া দিয়ে। সে নির্মাণ এত সাবলীল, মসৃণ যে ডায়রির পাতা আর উপন্যাসের পার্থক্য আপাতত বোঝা যায় না। শিল্প দৃষ্টির স্বচ্ছতা বিস্মিত করে। অপুর শৈশব কৈশোরের সারল্য, কৌতূহল বিস্ময়ভরা দৃষ্টি যে পাঠককে একটা দার্শনিক বোধে পৌঁছে দেয় তা টের পাওয়াই যায় না। অভাব, দারিদ্র্য, বঞ্চনা, দুঃখ-শোক সবকিছু ছাপিয়ে প্রকৃতির এক আনন্দময়রূপ, জীবন প্রবাহের এক স্বচ্ছন্দ চলমানতা, লেখকের কথায় - Vastness the space and passing time - এই সত্যকেই তিনি লিখে চলেন। অপু সত্যচরণ এই সত্য উপলব্ধি প্রকাশেরই বাহক। অরণ্যের পটভূমিকায় মঞ্চী, কুন্তা, ভানুমতি শুধু তিন সম্প্রদায়ের তিনটি নারী চরিত্র নয় প্রত্যেকেই সভ্যতার ইতিহাসের বাহক। ভানুমতির হাত ধরে বহুকালের অনার্য সভ্যতার কাছে মাথা নত করেছে সত্যচরণ; দোবরু পান্নার সমাধিতে পুষ্প অর্পণ করতে গিয়ে সত্যচরণ তা মনে না করে পারেনি। ভানুমতির সহজ সরল বন্ধুত্ব সত্যচরণকে মানসিক বন্ধনে বাঁধতে চায় কিন্তু নাগরিক সভ্যতায় লালিত সত্যচরণ তাকে দুর্বলতা মনে করে নিজেকে ভোলাতে চায়। কুন্তা রাজপুত লালসার শিকার। এই অরণ্যে দুর্ভেদ্য

প্রতিকূলতার মধ্যে দুই সন্তান নিয়ে তার বাঁচার লড়াই তীব্র জীবনতৃষ্ণার প্রতীক। মঞ্চীর চোখে পৃথিবীর আয়তন পাটনা শহরের থেকে বড় নয়। সত্যচরণের কাছে তার প্রত্যাশা একটি আয়নার অতিরিক্ত নয়। অতিদীর্ঘ ভারতীয় সভ্যতায় অরণ্যে পাহাড়ে ছোটবড় নদীর ধারে কত প্রকারের জীবন, জীবনবাসনা তার বৈচিত্র্য ভরা চলমানতা আমাদের উপহার দিতে চান বিভূতিভূষণ। এ সমস্তই লেখক বিভূতিভূষণের ভ্রমণপিপাসা, জীবনানুরাগের দ্বারা অর্জিত দার্শনিক ভূমানন্দের প্রকাশ।

'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থে তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় জানিয়েছেন তাঁর সাহিত্যের জীবন্ত মানবমূর্তিদের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্কের কথা। কোনো চরিত্রই কাল্পনিক অবাস্তব নয়, নিরন্তর এদের সঙ্গে লেখকের ওঠাবসা। হাসুলি বাঁকের সুচাঁদ বুড়ির সঙ্গে গল্প করেছেন, বিড়ি টেনেছেন। নিতাই বাউরি, সতীশ ডোম, রাজা পয়েন্টসম্যান, ঠাকুরঝি, বসন এরাই তো তাঁর কথাসাহিত্যের পাত্র-পাত্রী হয়ে দেখা দিয়েছে। কথাসাহিত্যে এদের বাস্তবের সম্পর্ক বদলেছে, যেমন ঠাকুরঝি মোটেই পয়েন্টস্‌ম্যান রাজার শ্যালিকা ছিল না, সতীশের সঙ্গে তার প্রেমও হয়নি (কবি উপন্যাস)। তাদের জীবন মৃত্যুও চলে গেছে লেখক তারাশঙ্করের হাতে। সবচেয়ে বড়কথা এইসব চরিত্রেরা বাস্তব, ইনডিভিজুয়াল হলেও লেখক এদের নির্মাণে রাঢ়ের গ্রাম জীবনের বাস্তবতা অপেক্ষা জীবন সম্পর্কিত তাঁর আইডিয়াকে কম গুরুত্ব দেননি। সতীশ ডোম উপন্যাসে হয়ে উঠেছে কবিয়াল নিতাই; যে নিতাই দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ। তার কবিজীবনের দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে দুই নারী ঠাকুরঝি ও বসন। রাঢ়ের রুক্ষভূমিতে কবিয়ালের দেখা পাওয়া অসম্ভব নয় কিন্তু সেই কবিধর্মের মূলে আছে রাঢ়ের সংস্কৃতির দ্বন্দ্বময়রূপ। একপ্রান্তে মহাপ্রভু ছড়িয়ে রেখে গেছেন কামগন্ধহীন প্রেমের সৌরভ, কাশফুলের নিঃকলঙ্ক প্রেমগাথা রাধা ঠাকুরাণী, উপন্যাসে ঠাকুরঝি সেই রাধাভাবের কামগন্ধহীন প্রেমের প্রতীক এবং অপর প্রান্তে রাঢ়ের জনবসতিতে আদিবাসী জীবনের দীর্ঘ অলিখিত ইতিহাস, যে জীবন প্রকৃতির মতই সরল হিংস্র ও কামগন্ধময় আদিমতায় উন্মত্ত, সেই সংস্কৃতিতেও দেহ-লালসার সুতীব্র ইঙ্গিত, উপন্যাসে ঝুমুর দলের গায়িকা বসন যার প্রতীক। এই দুই সংস্কৃতির মিলনেই জন্ম নিয়েছে নিতাই কবিয়াল। তারাশঙ্করের সুতীক্ষ্ণ জীবন পর্যবেক্ষণে রাঢ়ের ইতিহাস ও সংস্কৃতির এই নৃতাত্ত্বিক অভিজ্ঞান ছাড়া কবি উপন্যাসের চরিত্রেরা কালজয়ী নির্মাণে পৌঁছাতে পারত না। ঔপন্যাসিক এইসব চরিত্র নির্মাণে বাস্তবতাকে অনেক মূল্য দিয়েছেন কিন্তু তিনি কোনো একজন প্রতিবেদক বা দর্শক নন, ঔপন্যাসিক। কথকের চেতনে বা অবচেতনে জীবন-সম্পর্কিত একটি অভিজ্ঞান অভিজ্ঞতার নিরিখে দানা বাঁধে, আখ্যান চরিত্র সেই অভিজ্ঞানকে ভাষা দেবে। লেখকের কাছে চরিত্র, আখ্যান

বিবরণ সমস্তই তাঁর আইডিয়া প্রকাশের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা। চরিত্রের ভাষায় নিজে অভিজ্ঞতা ও ধারণাকে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করেন ঔপন্যাসিক।

নমুনা দীর্ঘ করে বা ধারাবাহিকতায় পাঠককে জীর্ণ করে প্রবন্ধকে আর ভা করার বাসনা নেই। মোট কথা আমাদের বলার বিষয় এই, কথাসহিত্যিক শিল্পে আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে নিজের অভিজ্ঞতা ও ধারণাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা ভঙ্গি দেখেন নানা ধরনের চরিত্র নির্মাণের মাধ্যমে। চরিত্রগুলি উপন্যাসে ইনডিভিজুয়াল, স্বাধীনরূপে বিচরণ করে, বস্তুবাদী কথাকার সচেতনভাবে সচে থাকেন তবু একথা সত্য যে শিল্পিতকরণ কখনোই অকৃত্রিম হতে পারে না। লেখকে একটা sensitiveness of mind আছে।এটা এক একজনের এক এক রকম। তি তা দিয়ে তাঁর দেখা চরিত্রগুলিকে বুঝতে চান, বুঝতে চান তাদের অনুভ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া জানানোর ভাষা-এভাবে আপাত পরিচিত অপরিচিত চরিত্রে লেখকের আপনার হয়ে পড়েন-নিজেকে সমৃদ্ধ, cultured বা প্রশিক্ষিত করে লেখক - এরপর শুরু হয় শিল্পিতকরণ। প্রতিভাবান লেখকের কাছে ব্যাপারটা এতটা সহজাত যে মনে হয় এর মধ্যে বুঝি কোনো সচেতন প্রয়াসই নেই, যাদের যেভাবে দেখেছেন তাদের সেভাবেই গল্পে উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন - বাস্তবিক এমনটি ঘটলে সে কথাসাহিত্য রিপোর্টাজের মাত্রা ছড়িয়ে উঠতে পারবে না।যথার্থ লেখক এই যথাযথতার লোভ সম্বরণ করেন। সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর ডায়রির পাতায় লেখেন -লেখকের পক্ষে আজকের দিনে সবচেয়ে কঠিন সাংবাদিকতার হাত থেকে লেখাকে বাঁচিয়ে চলা ।সবচেয়ে বড় লোভ।" চরিত্র রূপায়ণেও লেখক সৃজনশীল ভূমিকাই পালন করেন।উপাদান যেখান থেকেই আসুক সৃষ্টির ব্যাপারে স্রষ্টার দাবিই সর্বাধিক তিনিই ব্রহ্মা। সমস্ত চরিত্র প্রাকৃত, বাস্তব, স্বতন্ত্র হলেও কথাসাহিত্যে তারা লেখকে ভাবনারই ভিন্ন ভিন্ন প্রতিমূর্তি।চরিত্রকে নির্মাণ করতে বসে কথাকার নিজেকে, নিজে ধারণাকে, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে চরিত্রের ভাষায় প্রকাশ করে থাকেন।

Women and Environment -

a reading of 'The Coffer Dams' and 'Nectar in a Sieve'

Soma Mandal
Department of English

In this paper I try to analyze the representation of nature in Kamala Markandaya's two novels 'Nectar in a Sieve'(1954) and 'The Coffer Dams'(1969) with a focus on the ecofeminist theorization of the relationship between woman and nature .Though the two novels predate the emergence of ecofeminism as a theory they offer an opportunity to address its basic conception about the interconnection between women and environment. In both the two novels women witness a change in their environment : while Rukmani in 'Nectar in a Sieve' suffers as she is uprooted from her land , Helen the intelligent and sensitive woman from England reacts when she sees how men are trying to tame wild nature . Though the two women belong to two different worlds - Rukmani has her place in a remote village in global south of India and Helen symbolizes cultural elite who comes from a distant West - both of them experience the tension of displacement or dislocation caused by the forces of progress as a result of the compulsive urge for urbanization.

Ecofeminism holds that it is because of the patriarchal power structure that both the women and the ecology are oppressed. The twin dominations of nature and women are, in fact , an outcome of a social structure which sanctions the superiority of reason ,culture, men over emotions, nature and women .In her essay 'Ecofeminism: First and Third World Women' Rosemary Radford Ruether explains, '(This) socio-economic form of ecofeminist analysis then sees the cultural- symbolic patterns by which both women and nature are inferiorized and identified with each other as an ideological superstructure by which the system of economic and legal domination of women, land, animals is justified and made to appear 'natural' and inevitable within a total patriarchal cosmovision.' Vandana Shiva in her book 'Staying Alive – Women, Ecology and Survival in India' describes 'Prakriti' as an embodiment and manifestation of the feminine principle which nurtures creativity, and ensures inter-relationship of all beings. This concept radically differs , she argues, from the Cartesian concept of nature as 'resource'. Shiva coins

the term 'maldevelopment' in which the colonising male is the agent a model of 'development'. She marks the progressive shift towa rationality as the beginning of the displacement and marginalization women.

Kamala Markandaya's novel 'The Coffer Dams' opens with statement that underpins the distance between rationality and instinct 'It was a man's town. The contractors had built it, within hailing distance the work site, for single men and men who were virtually single by reas of being more than a day's walk away from their women and villages.(pg The opening statement with its emphasis on 'men' sets the tone of novel in which the rational approach to nature opposes the instinct perception of the vagaries and moods of the nature. The novel is about construction of coffer dams by an English engineering firm named Cli Mackendrick and Co. in some tribal village named Maluad in South Ind tame a turbulent river. In the process of the making of the dam, the vi on the outskirt of the jungle gets transformed into a little town. industrial town which has gorged out of the hill side consequently disr the rhythm of life of the inhabitants of the area – the inhabitants who dehumanized by the British officers. Helen, the wife of Cli Mackendrick, has been reminded by her husband that she is in country'(pg20) and therefore she should keep a distance from tribesmen who are not 'civilized'. Helen, however, does not share husband's concern. She vanishes into the jungle, and thinks of tribesmen as human beings'. She is appalled to find broken bits of po which she realizes ,had been part of some woman's life who cooked and fed her family and then they had all gone away and the vessels been broken and left behind, a whole community has been forced to m in order to provide a site for the dam.(pg24) She was more affected b rampant furious growth of the forest outside than by ordered charm restrained civilization. Though Bashiam, the 'jungly wallah' becomes linkman providing the information of the place the initial excursion she made was all by herself : 'But there was this path, which led ove brow of a hill to a shallow dip in the land beyond, an inhospitable strewn basin within sound of the river, because it was there she too (pg39) In her concern for the tribesmen she gradually drifts away fro husband and feels deeply for the changes caused by the dams. conflict of primitivism and technological progress Helen finds he

dislocated - she can neither feel like Bashiam who is 'de-tribalized' nor like Clinton who remains obsessed with structures rather than with living beings.

'Nectar in a Sieve' records an indigenous woman's relationship with environment which is threatened by the challenges of urbanization. Unlike Helen in 'The Coffer Dams' Rukmani, the central character in this novel, is the simple village woman who negotiates with the forces of progress in her own way. While her husband Nathan is ready to accept the change advising her as '...Bend like the grass, that you do not break',(pg30) Rukmani finds it hard to transform her life which is embedded in rural nature. The description of the village road which leads her to her husband's house is unmistakable; they rode for six hours on along the dusty road but stopped half way and ate a meal : 'boiled rice dhal vegetables and curds. A whole coconut apiece too, in which my husband picked a whole with his scythe for me so that I might drink the clear milk.'(pg5) thus the village provides almost anything that she needs. Her awareness of the surrounding nature is one of soothing pleasure; the air was full of the sound of bells, and of birds , sparrows and bulbuls mainly, she could hear mynahs and parrots . 'It was very warm ,and ,unused to so long a jolting , I felt asleep."(pg5) Later when Rukmani and her husband make a journey to their son's place in the city the difference is obvious : The journey to the city is not pleasant : 'Not only people but traffic – bullock carts, jutkas , cars and bicycles, ...The noise never let up: car horns ,bicycle bells and the crackling of whips, combined to produce a deafening bewildering clamour, amid which it was impossible to heed every warning sound.'(pg 147) People looked at them and they felt that they are not welcome in the city. Yet they went on 'through the streets of the terrifying city, amid the unaccustomed traffic and crowds,'

In the village they live in a kind of what Dana C mount recounts as 'symbiotic relationship' between farmers and nature. The land has its own vulnerability yet it is the centre of her life , she starts planting seeds herself and is awarded with a rich harvest. Rukmoni starts tending a small garden– I was young and fanciful then , and it seemed to me not that they grew as I did, unconsciously, but that each of the dry, hard pellets I held in my palm had within it the very secret of life itself, curled tightly within, under leaf after protective leaf for safekeeping, fragile, vanishing with the first touch or sight. With each tender seedling that unfurled its small green leaf to my

gaze, my excitement would rise and mount; winged, wondrous.'(pg 14
Her coming of age thus takes the metaphor of garden with which she is
intimately connected. Dana C. Mount records : 'Thus Rukmani experien
her own physical, emotional, sexual and psychological develop
through her work in the garden and the growth of her vegetables.' B
Rukmoni not only feels the richness of nature she also experiences
vulnerability . "Nature is like a wild animal that you have trained to work
you. so long as you are vigilant and walk warily with thought and care,
long will it give you its aid; but look away for an instant, be heedless
forgetful, and it has you by the throat."(pg 41.)

The encroachment of the tannery is the threat that Rukm
encounters in the novel: it not only claims the land of the villagers
transforms the green open field of the village into a private property. T
proprietor is the red faced white man who remains absent in the narra
–Shiv K.Kumer explains 'Thus laying the foundations of an indust
society based on the principles of exploitation of labour and absenteeis
Rukmani describes the encroachment in terms of 'invasion' – the tann
is actually the graveyard of animals, it restricts the free movement of
daughter . She notices how the birds are avoiding the village.
heightened awareness of her fellow creatures shows again and again ho
she lives in commune with nature's all living beings. "At one time there
been a kingfisher here, flashing between the young the young shoots
our fish; and paddy birds; and sometimes, in the shallower reaches of
river, flamingoes, striding with ungainly precision among the water ree
with plumage of a glory not of this earth. Now birds came no more for
tannery lay close- except crows and kites and such scavenging birds, ea
for the town's offal, ..." (pg 71)

The tannery grew and flourished polluting the green open space
The men in the tannery worked hard and the women too, but their way
life was, Rukmoni observed, ' quite different from ours.' As she was mo
used to open fields and the sky and the unfettered sight of the sun t
closed doors and shuttered windows of the houses of the tannery stru
coldly at her. Rukmoni is forced to accept it when her own son, Arju
refuses to be a farmer and joins the tannery. It not only transforms t
little village into a small town it changes the villagers too – they had
choice but to surrender because they did not own the land; the tannery
opposition to the land operates as the means which threatens to displa

the villagers if they fail to readjust themselves within its compass. Rukmani and Nathan are evicted from their land, they try to locate themselves into the city where they think their son Murugan has found a place. However they did not find him and they are forced to undergo tremendous hardship. Rukmani plays two roles in the city: as a letter writer and as a stone breaker in a quarry; but she dreams of returning home. Rukmani refuses to accept the 'cityscape as her fate'- her husband dies but she returns home which is the land and it becomes life to her starving spirit. Feeling the earth beneath her feet she weeps for happiness. 'The time of inbetween , already a memory coiled away like a snake within its hole'.(Pg192.)

Reference :

1. Staying Alive Women, Ecology and Survival in India., – Vandana Shiva
2. The Coffer Dams-Kamala Markandaya (Penguin Books)
3. Nectar in a Sieve – Kamala Markandaya(Penguin Books)
4. Postcolonial Ecocriticism, Literature, Animals, Environment- Graham Huggan and Helen Tiffin Ecocriticism- Greg Garrad, Routledge,2007
5. Bend Like the Grass: Ecofeminism in Kamala Markandaya's Nectar in a Sieve- Dana C. Mount,Postcolonial Text, Vol 6, No 3 (2011)postcolonial.org/index.php/pct/article/download/1189/1208
6. Tradition and Change in the Novels of Kamala MarkandayaAuthor(s): Shiv K. Kumar Reviewed work(s):Source: Books Abroad, Vol. 43, No. 4 (Autumn, 1969), pp. 508-513Published by: Board of Regents of the University of OklahomaStable URL: http://www.jstor.org/stable/40123776. Accessed: 12/12/2012 06:57
7. Conflict and Resolution in the Novels of Kamala MarkandayaAuthor(s): Prem Kumar Reviewed work(s):Source: World Literature Today, Vol. 60, No. 1 (Winter, 1986), pp. 22-27Published by: Board of Regents of the University of OklahomaStable URL:

http://www.jstor.org/stable/40141114. Accessed: 12/12/2012 06:54

8. ECOFEMINISM : FIRST AND THIRD WORLD WOMEN Author(s): Rosemary Radford Ruether Reviewed work(s):Source: American Journal of Theology & Philosophy, Vol. 18, No. 1, ECO-JUSTICE AND THE ENVIRONMENT (January 1997), pp. 33-45Published by: University of Illinois PressStable URL: http://www.jstor.org/stable/27944029 .Accessed: 19/12/2012 01:53

আমাদের প্রগতি শিল্প-সাহিত্য ঃ একটি সীমাবদ্ধ সমীক্ষা

সুপ্রিয় ধর
ইংরাজী বিভাগ

"Of these cities will remain. Only the wind that swept through them"

বের্টোল্ট ব্রেশটের অসাধারণ এই পংক্তি দুটির সরলার্থ ঃ পৃথিবীতে বিরাট এক নাটকের অভিনয় হতে চলেছে। শুধুমাত্র প্রকৃতি জগতেরই নয়, সযত্নে স্থাপিত মানুষের নির্মাণগতিক সৌধগুলোও সীমাহীনভাবে ধ্বংসের শিকার। প্রকৃতি এবং মনুষ্য সমাজ-জীবন আসন্ন বিপদের মুখে যেন বেঁচে থাকার, টিকে থাকার শেষ চেষ্টায় ক্লান্ত, তবুও এটাই চরম সত্য যে পুরনো, স্থবির, জীর্ণ সবকিছুর ধ্বংস অনিবার্য এবং নতুনের আবির্ভাব অপ্রতিরোধ্য।

প্রগতি সাহিত্যের মূল বিষয়বস্তু কি হবে, এবং কি হওয়া উচিৎ তা হয়তো ব্রেশটের উপরের দুটি পংক্তির মধ্যেই ব্যাপ্ত হয়ে আছে। ব্রেশটের মতো প্রগতি শিল্প-সাহিত্যের কাজ-কারবার যারা করবেন, তাঁদের একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে প্রগতি শিল্প-সাহিত্য একটা বিশেষ প্রকরণ নয়। তা প্রধানত একটা দৃষ্টিভঙ্গি, তা মূলত বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি। এবং তা অবশ্যই সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। প্রগতি শিল্প সাহিত্যিকদের সঙ্গে বুর্জোয়া শিল্প সাহিত্যিকদের পার্থক্যটা এখানে যে বুর্জোয়া শিল্প সাহিত্যিকরাও তাঁদের পারিপার্শ্বিক সামাজিক বাস্তবতার ছবি তাঁদের শিল্প-কর্মে ফুটিয়ে তোলেন। কখনো পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব এত বিরাট আকারে দেখা দেয় যে তখন বাস্তবের জটিল, বীভৎস অবস্থা থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে জটিলতায় নিজেরাও আক্রান্ত হন, এবং পাঠকের চেতনাতেও জটিলতা সঞ্চারিত করে দেন। আবার কখনো বা বাস্তবের যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তির উপায় আবিষ্কারে ব্যর্থ হয়ে আরো তীব্র যন্ত্রণাদায়কের সন্ধানে ব্রতী হন। কিন্তু প্রগতি শিল্প সাহিত্যিকরা মৌলিক সত্য বলে একে মেনে নেন যে সর্বহারাশ্রেণীর উদ্দেশ্য এবং কর্মপদ্ধতির মধ্যেই ভবিষ্যৎ সুখী সমাজের চাবিকাঠি লুকিয়ে রয়েছে। সুতরাং বুর্জোয়া শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে প্রগতি শিল্প-সাহিত্যের পার্থক্য প্রকরণগত নয়, তা প্রধানত দৃষ্টিভঙ্গির। বোদ্‌লেয়ারের দৃষ্টিভঙ্গি, মৃত্যুর জন্য তাঁর আকণ্ঠ পিপাসা, তীব্র যন্ত্রণাদায়কের জন্য তাঁর ব্যাকুল অন্বেষণ, আর গোর্কির স্নিগ্ধ জীবনবোধ, জীবনের সীমাহীন সম্ভাবনায় বিশ্বাস, নতুন পৃথিবীর

আবির্ভাবে তাঁর অসীম আস্থা কিছুতেই এক জায়গায় এসে মিলতে পারে না।

আর এখানেই প্রগতি শিল্পী-সাহিত্যিকদের বিরাট দায়িত্ব এসে যায়।
সমাজে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আছে, বিশেষ করে শ্রেণীগুলো যতদিন থাকবে ততদিন
শ্রেণী-বিরোধও নিশ্চয়ই বর্তমান থাকবে- এই সরল সত্যটাকে মেনে
সাধারণভাবে সমাজ বিকাশের সূত্রগুলোকে মেনে নিয়ে, এবং সমাজতন্ত্রের
বিশ্বাসী থেকে শিল্প-কর্ম সম্পন্ন করাটাই যথেষ্ট নয়; প্রগতি শিল্প সাহিত্যিকদের
লক্ষ্য রাখতে হবে সমাজে পরিবর্তনের রূপটাই আবার নতুন মাত্রাও অর্জন করছে
পরিবর্তনের চেহারাটাও বিভিন্ন সময়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পূর্ণ হচ্ছে কিনা। পূর্বনির্ধারিত
ধারণা নিয়ে প্রগতি শিল্প-কর্ম করা যায় না। এক ফলে সমগ্র ব্যাপারটাই একটা
নিরস ব্যাখ্যা মাত্র হয়, এবং সবকিছুই বড় বেশী সরলরৈখিক বলে মনে হয়।

আমাদের বাংলা প্রগতি শিল্প-সাহিত্যে এই ভুলটাই ঘটে যাচ্ছে, এবং তারই
আজো পর্যন্ত আমাদের প্রগতি শিল্প-সাহিত্য সাবালকত্ব অর্জন করতে পারলো
উপাদানের তো অভাব নেই, সমাজে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তো আছেই, পরিবর্তনও হয়ে
যেন একটা শূন্যতা, কিসের যেন একটা অভাববোধ থেকেই যাচ্ছে। আমার
আমাদের প্রগতি শিল্পী - সাহিত্যিকরা আদর্শ হিসেবে প্রচলিত সমাজের পরিবর্তন
এটা মেনে নিয়েছেন। কিন্তু তার সঙ্গেও যে গভীর সম্পর্ক এবং জ্ঞান থাকা
সমাজের পরিবর্তনের চেহারাটা কি রকম হচ্ছে, পরিবর্তনের স্রোত কোনদিকে
হচ্ছে, সেই স্রোতের মুখে মানুষের চেতনার জগতেও কি কি পরিবর্তন সংগঠিত
চলেছে, এবং সর্বোপরি তীব্র পরিবর্তনের মুখেও যে মানুষ পিছুটানে আবদ্ধ থেকে
পারে, থেকে যায় এই সমস্ত বিষয়গুলোকে ততটা প্রাধান্য দিচ্ছেন না। আমাদের
শিল্পী - সাহিত্যিকদের গল্প-উপন্যাস-কবিতা পাঠ করলে বর্ণিত বিষয় বা চরিত্র
একটা বিশেষ আদর্শের আদলে গঠিত বলে মনে হয়। কিন্তু তা কেন হবে?
উপন্যাসে বা কবিতায় সমাজতন্ত্রের বিজয় বার্তাটা ঘোষণা করে দিলেই তো হলো
মিছিল সমাবেশে সমাজতন্ত্রের আদর্শ প্রচার এক জিনিস, আর শিল্প-সাহিত্যে তা
ভিন্ন। কেননা সমাজতন্ত্রে উত্তরণ, আমরা তো সকলেই জানি একান্ত অবশ্যম্ভাবী।
উত্তরণের পথে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীগুলোর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার
অভাবিত নানা ঘটনার সমাবেশ, মানুষের চেতনার অসমবিকাশ সমাজতন্ত্রের
অনেক বেশী কন্টকিত করে তোলে। সুতরাং আদর্শ হিসেবে যা এরকম,
সংঘাতে তাই আবার বিভিন্ন, বিচিত্র হতে বাধ্য। বলতে দ্বিধা নেই আমাদের প্রগতি
- সাহিত্যিকরা সমাজ পরিবর্তনের এই বিভিন্ন ও বিচিত্র পথ অন্বেষণে যতটা না
তার চেয়ে অনেক বেশী আগ্রহী কি ভাবে সমগ্র বিষয়টাকে একটা আদর্শের আদলে

হোলা যায় তারই জন্য। আর সেজন্যই প্রগতি শিল্পী - সাহিত্য অতিসরলীকরণ দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ছে। এ প্রসঙ্গে মিনা কাউটস্কিকে লেখা এঙ্গেলস্-এর একটা চিঠির কিছু অংশ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ। "But it is always bad if an author adores his own hero and this is the error which to some extent you seem to have fallen into here. In Elsa there is still a certain individualization, though she is also idealized, but in Arnold the personality merges still more in the principle." এখানে অবশ্যই এঙ্গেলস্ বলেছেন যে চরিত্র-চিত্রণ বাস্তবের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে, তা অবশ্যই কোন তত্ত্ব বা আদর্শের চেহারা নেবে না। একই চিঠির আরেক অংশে এঙ্গেলস্ বলছেন- "You obviously felt a desire to take a public stand in your book, to testify to your convictions before the entire world." আমাদের প্রগতি শিল্পী - সাহিত্য মহলে এটা তো কখনো কখনো প্রায় এক উন্মাদ মানসিকতার চেহারা নেয় যে গল্প-কবিতা-উপন্যাসে কি বলা হোল সেটা বড় কথা নয়, কি ভাবে পাঠকের কাছে নিজের আদর্শটাকে প্রচার করা যায় তারই চেষ্টা করা। একথা ঠিক যে প্রগতি শিল্প সাহিত্যিকরা রোমান্টিকদের মতো কোন কল্পিত সমাজব্যবস্থা বা কাল্পনিক ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস করেন না, বিশ্বাস করেন না কোন অস্পষ্ট স্বর্গরাজ্যের আশায়; তাঁরা বিশ্বাস করেন সমস্যাবলী থাকা সত্ত্বেও আগামী দিনের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আমাদের প্রগতি শিল্পী - সাহিত্য মহলে এখানেই একটা বিরাট ভ্রান্তি ঘটে যাচ্ছে। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সমাজের আবির্ভাবটা যে বিভিন্ন দ্বন্দ্ব এবং ঘটনা এবং চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমেই পাঠকের কাছে উপস্থিত করতে হবে তা যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে না। এর ফলে গোটা ব্যাপারটাই কেমন যেন পূর্ব-নির্ধারিত, সাজানো বলে মনে হয়। অথচ এঙ্গেলস্ কিন্তু খুব পরিস্কার বলেছেন " I think however that the purpose becomes manifest from the situation and the action themselves without being expressly pointed out and that the author does not have to serve the reader on a platter the future historical resolution of the social conflicts which he describes."

বক্তব্য বিষয়ের এই অতিসরলীকরণের ঝোঁক সমানভাবে তাই আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও ছাপ ফেলেছে। গল্প, কবিতা কিংবা উপন্যাস-সাহিত্য এই প্রতিটি বিভাগেরই কিছু নিজস্ব নিয়ম, নিজস্ব কিছু প্রকরণগত দাবী আছে। এই সব নিয়ম এবং দাবীগুলোকে অমান্য করলে, বক্তব্য বিষয় যতই বিপ্লবী হোক না কেন,তা সাহিত্য হবে না। কবিতাটাকে প্রথমে কবিতাই হতে হবে, অন্য কিছু হলে তো চলবে না। আমাদের প্রগতি মহলে গল্প-কবিতা উপন্যাসে আঙ্গিকগত প্রকরণ নিয়ে কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চোখেই পড়ে না। কিন্তু তা কেন হবে? নতুন নতুন প্রকাশের মাধ্যম আবিষ্কারে বাধাটা কোথায়?

আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাতেই বা কোথায় বাধা? নতুন নতুন বাস্তব ঘটনাকে ব
জন্যই তো নতুন নতুন প্রকাশ-মাধ্যম, আঙ্গিকের প্রয়োজন। মানিক বন্দোপাধ্যায়কে
প্রগতির সাহিত্যের একজন প্রধান পুরুষ বলে মনে করা হয়। মানিকবাবু কি 'পু
নাচের ইতিকথা' লিখতে গিয়ে যে শিল্প মাধ্যমের সাহায্য নিয়েছিলেন, 'পদ্মানদীর ন
তেও কি একই শিল্প-মাধ্যম অনুসরণ করেছেন? আমরা একথাটা কেন মনে কর
পাঠকদের কাছে সহজ, সরলভাবে কোন বিষয়কে উপস্থিত করতে না পারলে প
তা বুঝতে পারবেন না? সমস্ত বিষয়টাকেই যদি আমরা আগে থাকতেই ছক
সাজিয়ে নিয়ে লিখতে বসি তাহলে সাহিত্যে, শিল্পে যে স্বাচ্ছন্দ্য, অনুভূতির যে তী
মননশীলতার যে প্রাণের রস আমরা অনুভব করতে চাই তা কিছুতেই পাই না। আ
প্রগতি শিল্প-সাহিত্য জগতে এরকমই প্রাণহীন নিরুত্তাপ হাওয়া বইছে।

আর কতদিন আমরা এরকম প্রাণহীন, ধূসর সংগীত শুনবো?

আমাদের চেনা জানা পরিবেশে উপকরণের তো অভাব নেই। শ্রেণীগুলো
একই আছে। শ্রেণী-বিরোধ, শ্রেণী-বিদ্বেষ আরো তীব্রতা অর্জন করছে।
দার্শনিক, রাজনৈতিক চিন্তাধারাতেও পরিবর্তন হচ্ছে, নতুন মাত্রা যুক্ত হচ্ছে। মানু
চেতনার জগতেও পরিবর্তন ঘটছে। প্রগতি শিল্প-সাহিত্য-সৃষ্টির এটাই তো উর্বর
উপযুক্ত পরিবেশ। জীবনের অসীম সম্ভাবনা, সীমাহীন অর্থময়তার কথা উ
ভাষায়, অভূতপূর্ব শৈল্পিক সুষমায়, নিবিড়তর আঙ্গিক দক্ষতায়, মৌলিক ভ
রূপান্তরিত হয়ে প্রগতি শিল্প সাহিত্যে কি স্বীকৃত হবে না?

আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নতুন নতুন আবিষ্কারও যেমন শিল্প-সাহিত্যে স্বীকৃত, তে
প্রাচীন যুগের শিল্প-সাহিত্যের আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাতেও কোন বাধা নে
বরঞ্চ প্রাচীন যুগের শিল্প সাহিত্যের আঙ্গিক থেকেও প্রগতি শিল্পী-সাহিত্যিদের অ
কিছু শিক্ষণীয় বিষয় থাকে, তাতে করে একদিকে যেমন আঙ্গিক নির্মাণের কুশলত
দক্ষতা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা যায়, তেমনি একটি বিশেষ যুগের শিল্প-সাহিত্যে
ইতিহাস, শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্ত সম্বন্ধেও অবহিত হওয়া য
এর ফলে প্রগতি শিল্প-সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়, কেননা প্রগতি শিল্প-সাহিত্যিকরা তা
সৃষ্টিকর্ম সম্পাদনের মুহূর্তে জানতে পারেন পূর্ববর্তী শিল্প-সাহিত্যের ঐতিহাসিক
এবং বিবর্তনের প্রক্রিয়াকে, কোন্ বিশেষ সামাজিক পরিবেশে সে সময়ের শি
সাহিত্যিকরা নিশ্বাস নিয়েছিলেন এবং তাদের সৃষ্টিকর্ম সম্পাদন করেছিলেন তা
বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসকে। প্রগতি শিল্প-সাহিত্যের শরীরে তাই যতটা পরিমাণে নতুন ব
অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন আঙ্গিক, নতুন প্রকাশ-মাধ্যম, শিল্প-মাধ্যম লিপ্ত হ
থাকবে, ঠিক ততটা পরিমাণেই সম্পৃক্ত হয়ে থাকবে, প্রাচীন যুগের শিল্প-সাহিত্যে

শৈল্পিক নির্মাণ কৌশলের মধ্যে যা কিছু মহৎ, সৃষ্টিশীল এবং প্রাসঙ্গিক। এ ব্যাপারে কোন শুচিবায়ুগ্রস্ত মনোভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। রাজনৈতিক মতবাদ এবং সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থিত শিল্প-সাহিত্যিকদের কাছে অনেক কিছু শিক্ষণীয় থাকতে পারে। এ ব্যাপারে আদর্শগত ব্যবধান প্রগতি শিল্প-সাহিত্যের সৃষ্টিতে যেন কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে। মার্কস, এঙ্গেলস্, লেনিন তাঁদের বিভিন্ন রচনায় প্রগতি শিল্প সাহিত্য জগতের কর্মীদের সংকীর্ণতামুক্ত [illegible] তো বলেছেন।

প্রগতিশীল শিল্পকর্মে যারা ব্যাপৃত থাকবেন তাঁদের অবশ্যই কোন একটি বিশেষ প্রকরণ ধারার মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখলে সমাজ বাস্তবতার সম্পূর্ণ চিত্রায়ন সম্ভব হয় না। এ ব্যাপারে প্রগতি শিবিরের লেখকদের প্রকরণের সন্ধানে ফিরে যেতে হবে নবজাগরণের অধ্যায়ে। রেনেসাঁ অবশ্যই জন্ম দিয়েছে অসাধারণ শিল্পী সাহিত্যিকদের। কিন্তু যাঁরা প্রগতিশীল শিল্পকর্মে নিজেদের নিয়োজিত রাখবেন, বৃহত্তর অর্থে Socialist Realism -এর তত্ত্বকে, বাস্তবায়িত করবেন, তাঁদের কাছে দস্টয়েভস্কির বাস্তবতা, টলস্টয়ের চার্লস ডিকেন্সর বাস্তবতা অবশ্যই মান্য; কিন্তু প্রগতি শিবিরের লেখক, শিল্পীরা হোমার, বাইবেল, শেকস্‌পীয়ার, ব্রেশট্ কিংবা য়েটস্‌-এর কাছ থেকেও নতুন সামাজিক বাস্তবতাকে প্রকাশ করার জন্য প্রকরণের পাঠ কেন নেবেন না? ব্যাপারটা অনুকরণের প্রশ্ন নয়, আসলে সমগ্র বিষয়টা হলো মানব সভ্যতার ইতিহাসের বিষয় বস্তু ও প্রকরণের বিচিত্র প্রকাশ ভঙ্গি এবং তাকে আত্মস্থ করার মানসিকতা।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলন উপলক্ষে প্রেরিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বার্তার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে আমার কথার ইতি টানছি এই বিশ্বাসে যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্ধৃতাংশ প্রগতি শিবিরের কর্মীদের কাছে উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হিসাবে কাজ করবে।

"...... But it is equally true that a writer isolated from the society can never become familiar with humanity. To be able to know the society and to point to its course of progress it is imperative that we feel the pulse of the society and hear its heart beats ...... Literature will fail if it is not in harmony with humanity. This fact illumines my heart like the light of truth and no argument can extinguish it .... It must be a writer's duty to instil new life into the country, sing the songs of awakening and valour, to carry the message of hope and happiness to every human being and not to let any body despair.

Don't forget that creating literature is a trying task. Sh
off the slough of 'ego' if you want to search for truth and be
Learn to blossom forth like a bud does out of the wooden s
and see how pure is the air, how pleasing the light and h
clear the water."

JNANADANANDINI DEVI : HER "OWN" VOICE

Dr. Jayashree Sarkar
Department of History

This present paper is an attempt to hear the voice and look into life of an enlightened woman, Jnanadanandini Devi (b. 1850), gradually maturing into a woman with new awareness from a seven year old young bride.

In the nineteenth century, the Indian elites welcomed missionary women for they wanted their women to learn the English language and certain English ways but insisted that they be taught in their own home. These men were highly influenced by the Victorian ideal of mid-nineteenth century and aimed at obtaining female companions who should combine within themselves the virtues of both Indian and English housewives.[1] Women too were caught between the two worlds - the old world they had known and the new one that was emerging.

Born in 1850, in rural Jessore, Jnanadanandini was married at a young age of seven to Satyendranath Tagore, who later became the first Indian Civil Servant and immediately came to her in-law's house at Jorasanko in Calcutta.But her intellectual root could be traced earlier. Before her marriage, she had a certain elementary education in her paternal village where her father used to run a "Pathsala" (a village school imparting elementary level education). She reminisced that she used to attain that pathsala and used to sit among the older Muslim boys[2]. Her marriage brought her to an enlightened "antahpur" (inner quarter of a Bengali household) of Jorasanko where some of the female members were respected as highly educated[3]. There she saw her father-in-law, Maharshi Devendra Nath Tagore took the responsibility of teaching the 'antahpur' women. He even made arrangement to appoint a 'Pandit' (a learned man in Sanskrit) as well as missionary women for teaching. Her brother-in-law Hemendranath used to

teach her while Satyendranath was in England to appear the Indian Civil Service Examination[4].

But to Satyendranath, such level of education seeme insufficient for women's emancipation.He was quite sensit regarding injustice inflicted on women. He was an arde advocate of women's education and a true sympathiser women's cause. For that, his sister Swarnakumari De expressed her gratitude "স্ত্রী জাতির উন্নতিতে ইনি এমনই অটল ছিলেন, মহিলাদিগের মঙ্গল - কল্পনায় ইনি এমনই আনন্দলাভ করিতেন যে জন্য তিনি কোন বাধাকেই বাধা জ্ঞান করেন নাই।"[5] Being the first member the Indian Civil Service in England, he translated John Stu Mill's 'Subjection of Women'. While in England, he compare the position of women of his country with that of Englan Obviously, the condition of his wife Jnanadanandini Jorasanko "antahpur" appeared to him like a "caged bird such a pitiful existence would lead to a baneful effect on h health and intellect. He too, was a product of concurrent soc cultural state of society. So he urged her earnestly to come England for her emanicipation "তুমি এখন পিঞ্জরের পাখির মত বদ্ধ রহি ও তোমার শরীর ও মনের স্ফূর্তি ও উন্নতির একটুকু স্থান নাই। তুমি এদেশে তোমার স্বাধীনতার প্রশস্ত ক্ষেত্র পাইবে।"[6]

His frequently sent letters from England, expressed growing concern for his wife's betterment and education, be suitable for her - " তোমাকে কি প্রকার অবস্থায় রাখিব, তোমার শিক্ষা কি ভালো হইবে - কোথায় থাকিলে ও কি প্রকার সংসর্গে থাকিলে উন্নতি লাভ করিবে, সকল বিষয় আমার সর্বদা মনে উদয় হয়"[7] He cherished the dream that Jnanadanandini would set an example of Indian women - আমার ইচ্ছা তুমি আমাদের স্ত্রীলোকের দৃষ্টান্তস্বরূপ হইবে।"[8] He was vehement critique of social custom, child marriage amo girls, prevalent in Indian society and attaining ea motherhood. Though he married a seven year old girl, reminded her that he would not enter into any marit relationship till Jnanadanandini attain her maturity, acqui knowldge and sufficiently educated.[9] But such a desire cou only be fulfulled on her coming to England,[10] for whic

Satyendranath sought earnestly his father's permission. He was full of remorse when he did not succeed to get the necessary permission from his father who moreover warned Satyendranath not to interfere in matters relating to the customs of "antahpur".[11] But in the long run, he did succeed. His continuous efforts seemed to bear fruits - Jnanadanandini, alone went to England with her three young children in 1877 and stayed there for more than two years.[12]

Satyendranath, influenced by the Victorian ideal of women's education and enlightenment, wished his dream to find fulfillment in Jnanadanandini. But his endeavour started early just after his marriage when he made an effort to acquaint his young wife with his intimate friend Manmohan Ghosh so that Jnanadanandini could overcome her shyness. But the method he chose, a " clandestine " of course, failed.[13] But he was successful in making wife accompany him to his places of work for he was determined to break the rules of the "antahpur" so as to strike at the citadel of orthodoxy. He knew that ripples of such a beginning would gradually be felt throughout the country.[14] Even after staying in Bombay, she could not overcome her initial hesitation. She had an embarassing situation when she was introduced to the Governor of Bombay, Sir Burtell Phrear. Similar incidents did happen on some occasons.[15] Bit it was a temporary affair and she gained the ability to master such situations.[16] While staying at western India, she was full of admiration about the relatively better position enjoyed by the women in those parts.[17] At Satyendranath's insistence, she attended Governor's party at Calcutta for which she was much criticised even by other members of Tagore family.[18]

Stepping out of the "antahpur", did produce a positive result. At Bombay, she observed the style of wearing sarees by women of Parsee and Gujrati communities. She introduced such a style in 'Bengal' and the fashion of wearing in that particular style "Brahmika Sari' became very popular. To her niece, Saraladevi Choudhurani," বাঙ্গালী মেয়েদের পরিচ্ছদে ভারতীয়

ঐক্যসাধনে মেজমামী প্রথম পথপ্রদর্শিকা।[19] She even left her mark
composing two dramas for her grandson - "Sat Bhai Champ
and "Tak Dumadum Dum", published in 1910, in a very luc
and attractive style.[20] Contrary to the custom of Jorasanko, sh
admitted her son Surendranath to St. Xavier's School a
daughter Indira to Loreto Convent. Regarding outlook a
matters relating to dresses and manners, Janandanandi
children were highly anglicized after their return from Englan
Janandanandini took initiative in holding parties and givi
gifts on birthdays for her own children as well as oth
members of the household. To Saraladevi, it was a new custo
in the tradition - bound Jorasanko.[21]

In the ultimate analysis, the question that remains to b
answered did the stepping out of the "antahpur" into a differe
cultural and social ambience culminate in the dawn of a
independent search for identity? How did she respond to h
husband's efforts and how her self-perception becam
transformed?

To Ghulam Murshid, at the end of the nineteenth centur
the educated Bengali middle - class women accepted the nee
of educating themselves though they did not feel the need t
break the traditional values of a patriarchal society. They cho
to remain within the frame of an 'Ideal' woman as idealised b
their menfolk. Expression of individuality was not heard. A
'ideal mother' and a 'modern wife' as envisaged throug
patriarchal values for a woman being educated, the notion wa
accepted by women too as objectives of education.[22]

Janandanandini's views about women's educati
reflects in her essay which more or less conforms to th
nineteenth century ideals of womenhood. To her, a woma
should concentrate in doing her domestic chores in a be
possible way. She included nursing the seek, cooking but
course going through the quality of the ingredients for which
elementary knowledge in Chemistry is necessary, chi
rearing, knitting and sewing. If a women was educated, the
only her children would remain healthy and educated. Th

would guarantee welfare of the country. After fulfilling these primary objectives, a women could pursue any other type of education for her mental upliftment and indulge in such activities that would be for the good of the country - 'প্রতি মাতা সুশিক্ষিতা হইলেই তাঁর সন্তানেরা সুস্থ ও সুশিক্ষিত হইবে - আর তা হইলেই দেশের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধিত হইবে। গৃহ পরিপাটা, পরিচ্ছদাদির সুব্যবস্থা, গৃহস্থিত ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যবর্ধন, পীড়িতদিগের সেবা, আহারের দ্রব্য নির্নয় ও প্রস্তুত এবং সন্তান পালন - এই কয়েকটা প্রয়োজনীয় বিষয় সুশিক্ষিত হইয়া তার পরে যে স্ত্রীলোক আর যত কিছু বিদ্যা শিখিয়া নিজের মনের উন্নতি, অন্যের সন্তোষবৃদ্ধি বা দেশের হিতসাধন করিতে পারেন তাহাই ভাল।'[23] In matters of social reform, she did not articulate any completely new outlook but a note of compromise did echo in her essay, read at the conference of the **Banga Mahila Sabha** But such an expression was based on a rational bend of her mind, which brought into focus a catholic mind that Janandanandini could appreciate and accept "good" of every culture. To her, modern thinking did not necessarily mean severing connection with tradition. Certain customs, deeply rooted in Indian culture had proved beneficial for the society. The efficacy of a particular custom varied from country to country. She put forward the notion of "Streedhan", the property on which a woman had the sole right, which was unique in Indian tradition.[24]

Inspired and influenced by her husband, she did echo certain male - defined values regarding women's education and other aspects of life. But it will be grossly inappropiate to label her as a product of cherished ideal of 19th century English educated Bengali male intelligentsia. Perhaps she realized no conflict in a judicious mixture of Western values and indegenous culture. Her eclectice vision and compromising attitude did help to create a 'space' of her own.

Notes :

1. S. N. Mukherjee, "Rammohon Roy and the Stat... Women in Bengal in the Nineteenth Century" ... Michael Allen and S. N. Mukherjee (eds.), **Wom... of India and Nepal, Australia** 1982, p.155
2. Janandanandini Devi, "Smriti Katha" in Par... Gangopadhyay (ed), in **Janandanandini De... Rachana Samkalan**, Calcutta, 2011, p.40
3. **Bharati**, March-April 1916
4. Saudamini Devi, 'Pitrismriti', **Prabasi**, Febru... March 1912
5. Swarnakumari Devi, 'Sekele Katha' , **Bha...** March-April 1916.
6. Satyendranath Tagore's letter to Janandanan... Devi, Letter No. 5, London, 18th February 18... (henceforth "letter") inParthajit Gangopadh... **op.cit**. p.p 217-218
7. Letter no. 2 London 16th November 1863, **Ibid** ... 212-213.
8. **Ibid.**
9. **Ibid.**
10. Letter no. 3, London 11th January 1864, **Ibid**, p 21... 215
11. Letter no. 8, London 2nd July 1864, **Ibid** pp 220-222
12. **Smriti Katha**, op. cit. p 47; Indira De... Chowdhurani, **Smritisamput**, vol.I, Calcutta, 199... p.2
13. **Ibid** p. 38
14. Satyendranath Tagore, **Amar Balya katha O... Bombaiprabas**, 2nd edn., Calcutta, 1967.
15. **Samritikatha**, op. cit. p-41
16. Mary Carpenter, **Six Months in India**, Vol-... London, 1868, pp 32-33

17. Janandanandini Devi, **"Amader Bombai Bhraman" Bamabodhini Patrika**, February-March, 1975.
18. **Smriti Katha**, p 43
19. Sarala Devi Chaudhurani, **Jeeboner Jharapatha**, Calcutta, 2007, pp. 58, 59
20. Parthajit Gangopadhyay "Bhumika", **op.cit.**
21. **Jeebaner Jharapata**, pp 34, 35, 54, 55.
22. Ghulam Murshid, **Naari Pragati : Adhunikatar Abhighate Bangaramani**, Calcutta, 2001, p. 49
23. Jnandanandini Devi, "Stree Siksha", **Bharati,** June-July, 1881.
24. Janandanandini Devi, "Samaj Sanskar O Kusanaskar', **Bharati** , June-July, 1883.

Autonomous and Secessionist Movements in Indonesia

Tuhina Sarkar
Department of Political Science

Overview

Indonesia is the world's most populous Muslim na and is the world's fourth-most populated nation overall a China, India and the United States. Its population is growing approximately 3 million peple a year[1]. It has extensive na resources. A large percentage of world trade transits strategically important straits of Malacca that link the Ind Ocean littoral to the South China Sea and the larger Pac Ocean basin. Indonesia is also perceived by many as geopolitical centre of the Association of Southeast As Nations (ASEAN), which is a key factor in the geopoli dynamics of the larger Asia-Pacific region.

Indonesia continues to emerge from a period authoritarian rule and is consolidating its status as one of world's largest democracies. Some 86% of Indonesians a Muslim and the overwhelming majority subscribe to a mode form of the religion, giving Indonesia the potential to act as counter balance to more extreme expressions of Isla Despite this, radical Islamists and terrorist cells have operat in the country. Internal strife and social dislocation stemmi from inter-communal discord, autonomous and secession movements, political machinations among elites, Islam extremism, government corruption and economic uncertai have all undermined stability in Indonesia in the past. Recen Indonesia has conducted elections widely consided free a fair and building a more robust civil society. Althou Indonesia's economy suffered major setback during the Asia financial crisis of 1997/98, it has weathered the recent glob economic downturn relatively well.

Historical Background

Modern Indonesia has been shaped by the dynam

interaction of indigenous cultures with external influences - especially the succession of influences of Hinduism, Buddhism, Islam, Dutch colonial rule and a powerful and nationalistic independence movement. The geographic definition of modern Indonesia began to take shape under Dutch direct colonial rule, which began in 1799. The Dutch East Indies were occupied by Japan during world war II. Following the Japanese surrender in 1945, independence was declared by nationalist leader Sukarno. Following a four-year anti-colonial insurrection, the Republic of Indonesia gained its independence from the Dutch in 1949. There are nearly 490 ethnic groups in Indonesia : Javanese 45%, Sundanese 14%, Madurese 7.5%, coastal Malay 7.5%, others 26%.

Autonomous and Secessionist Movements

Centre-periphery tensions between the dominant Javanese culture where and minority groups in outlying regions have been sources of political instability and strife for the Indonesia state. Indonesia has in recent years adapted its approach to such strife and done much to alleviate autonomous or secessionist tensions. This relatively more moderate approach has reached accomodation where other efforts to quell Indonesia's centrifugal tendencies have failed.

The primary security threats to Indonesia are generally thought to come from within. The political centre of the Indonesian archipelago is located in Jakarta on Java, the densely populated island where 60% of Indonesia's population lives. Traditionally, power has extended from Java out to the outlying areas of Indonesia. This has been true both under Dutch rule, when Jakarta was Known of Batavia and with the modern Indonesian state. Throughout its history there has been resistance in peripheral areas to this centralised control. This manifested itself in the predominantly Catholic former Indonesian province of East Timor, which is now an independent state, as well as in the far west of Indonesia, in Aceh and in the far eastern part of the nation,in Papua and West Papua. Each of these regions has strong ethnic, culltural

and religious identities very different from those of Java.

East Timor

The Portuguese, whose influence in Timor dates to the 1600s, gave up control of the island in 1975. Three main parties emerged with the Portuguese departure. Of these, Frente Revolucionaria, do Timor Leste Independente (Fretelin), a leftist leading group, soon emerged as the dominant party. On December 7, 1975, Indonesia invaded East Timor with the tacit compliance of United States and Australia[2]. Indonesia, Australia and United States are thought to have been concerned that East Timor would turn into another Soviet satellite state similar to Cuba. A third of the population of East Timor is thought to have died as a result of fighting or war induced famine during the subsequent guerilla war fought by Fretelin against Indonesia's occupation.[3]

On August 30, 1999, East Timorese voted overwhelmingly to become an independent nation. 98.6% of those registered to vote in the referendum voted with 78.5% rejecting integration with Indonesia. In the wake of the vote pro-integrationist militias attacked pro-independence East Timorese and destroyed much of East Timor's infrastructure. More than 7000 East Timorese were killed and another 300,000 out of a total population of 850,000 were displaced, many to West Timor. Hard-line elements of TNI (Indonesian National Defense Force) formed pro-integrationist militias in East Timor. These groups sought to intimidate the East Timorese into voting to remain integrated with Indonesia under an autonomy package being offered by then President Habbibie[4].

It is thought that TNI had two key reasons for trying to forestall an independent East Timor. First, there was an attachment to the territory after having fought to keep it as a part of Indonesia. Second, was the fear that East Timorese independence would act as a catalyst for further secession in Aceh and Papua. The subsequent devastation of East Timor may have been meant as a warning to others who might seek

its secessionist example.

East Timor gained independence in 2002. Since then Indonesia and East Timor have worked to develop good relations. The Joint Commission of Truth and Friendship was established to deal with past crimes[5]. A2,500 page report issued in early 2006 by the East Timorese Commission for Reception, Truth and Reconciliation(CAVR), which was given to United Nations General Secretary, found Indonesia responsible for abuses of East Timorese during its period of rule over East Timor. The report reportedly found that up to 180,000 East Timorese died as a result of Indonesian rule.[6] This created tension in the bilateral relationship between Indonesia and East Timor and dilemma for the U.N. Nevertheless, the then East Timorese President Xanana Gusmao and President Yudhoyono reaffirmed their commitment to continue to work to resolve differences between the two countries.[7] More recently, the new President Ramos-Horta called on the people of East Timor to accept that Indonesians who committed human rights abuses in East Timor would never be brought to justice so that East Timor could move forward[8]

A 2005 U.N. Commission of Experts found the Jakarta trials for crimes committed in 1999 to be "manifestly inadequate."[9]

Aceh

Aceh is located at the extreme northwestern tip of the Indonesian archipelago on the island of Sumatra. The 4.4 million Acehenese have strong Muslim beliefs as well as independent ethnic identity. Many Achenese have in the past viewed Indonesia as an artificial construct that is no more than "a Javanese colonial empire enslaving the different peoples of the archipelago whose only common denominator was that they all had been colonized by the Dutch."[10]

The Acehenese fought the Portugese in the 1520s as well as the Dutch in later years." The Dutch Aceh War lasted from

1873 to 1913; making it possibly the longest continuous colonial war in history. As a result of their resistance and independence, Aceh was one of the last areas to come under Dutch control. Its struggle for independence from Indonesia was once again taken up by the group Gerakan Aceh Merdeka (GAM) until a peace agreement was reached in the wake of the December 2004 tsunami which killed over 130,000 people and devasted much of Aceh. The peace agreement signed by GAM and the government of Indonesia in Helsinki in August of 2005 brought an end to a conflict that claimed an estimated 15,000 lives. Partial autonomy was granted to Aceh under the agreement as was the right to retain 70% of the province's considerable oil and gas revenue.

The recently resolved struggle dates to 1976. In the late 1980s, many of GAM's fighters received training in Libya. GAM then began to reemerge in Aceh. This triggered suppression by the TNI from which GAM eventually rebounded. Former President Megawati then called on the military to once again suppress the Free Aceh Movement. This was the largest military operation for the TNI since East Timor. The decision to take a hard-line, nationalist stance on Aceh was popular at the time among Indonesian voters outside of Aceh.[12]

Indonesia has, under the leadership of President Yudhoyono, been able to leverage the opportunity presented by the 2004 tsunami and achieved a peace settlement where previous peace efforts had come unraveled. Under the agreement, the Free Aceh Movement (GAM) disarmed in December 2005 as the Indonesian military TNI dramatically reduced its presence in Aceh.

Papua

Papua, formerly known as West Irian or Irian Jaya, refers to the western half of the island of New Guinea and encompasses the two Indonesian provinces of Irian Jaya Bharat and Papua. The region is also known as West Papua. Papua has a population of aproximately 422, 000 squa

kilometers, which represents about 21% of the land mass and less than 1% of the population of Indonesia. Papua has a long land border with Papua New Guinea to the east.

Approximately 1.2million of the inhabitants of Irian Jaya Barat and Papua are indigenous people from about 250 different tribes, the rest have transmigrated to Papua from elsewhere in Indonesia. There are some 250 language groups in the region. Papuans are mostly Christians and animists. The province is rich in mineral resources and timber.[13]

Indonesian Papuans are a Melanesian people and are distinct from the Malay people of the Indonesian archipelago. Papua like Indonesia was a Dutch colonial possession. Papua did not become a part of Indonesia at the time Indonesia's independence in 1949. The Dutch argued that its ethnic and cultural diference justified Dutch control until a later date. Indonesia under president Sukarno began mounting military pressure on Dutch West Papua in 1961. United States sponsored talks between Indonesia and Dutch and proposed transfer of authority over Papua to the United Nations. According to the agreement the United Nations was to conduct an Act of Free Choice to determine the political status of Papua. The Act of Free Choice was carried out in 1969 after Indonesia had assumed control over Papua in 1963. The Act of Free Choice, which led Papua to become part of Indonesia, is generally not considered to have been representative of the will of all Papuans. A referendum on Indonesian control over Papua was not held. Instead, a group of 1,025 local officials voted in favour of merging with Indonisia. As a result, U.N. is generally considered to have failed in its mission to give the people of Pupua an opportunity for self determination.[14] The pro-independence Free Papua Movement emerged as these events were unfolding. Human rights advocate groups estimate that 100,000 Papuans have died as the result of Indonesian control in Papua due to military action and population displacement, though others have challenged the scale of this figure.[15]

President Yudhoyono has ruled out independence for Papua but has at times appeared open to some degree of autonomy for the province. In August 2010, Yudhoyono called for an audit of Special Autonomy programmes for Papua and West Pupua.[16] Yudhoyono is opposed to the internalization of the conflict and views it as an internal affair for Indonesia. President Yudhoyono has stated that "the government wishes to solve the issue in Papua in a peaceful, just and dignified manner by emphasizing dialogue and persuasive approach." He added that "we decline foreign interference in settling the issue."[18]

References

1) "Indonesia's Population Increasing by 3 Million Yearly", Xinhua News Agency, June 3 , 2008.
2. "Ford and Kissinger Gave Green Light to Indonesia's Invasion of East Timor, 1975," The National Security Archives, December 6, 2001.
3. Michael Mally, "Regions: Centralization and Resistance," in Donald Emmerson ed. Indonesia Beyond Soharto : Polity, Economy, Society Transition (Armonk : M.E. Sharp, 1999).p.98.
4. John Haseman, "Indonesia," in David Wiencek, ed. Asian Security Handbook. 2000
(Armonk : M.E. Sharpe Publishers, 2000).
5. "Indonesia : International Relations," The Economist Intelligence Unit, May 17, 2005.
6. Sian Powell, "Xanana and SBY Let Shame Flag Slide," The Australian, February 18, 2006.
7) Rob Taylor and Olivia Rondonuwu," Gusmao Yudhoyono Meet in Bali," AAP Bulletins, February 17, 2006.
8) "East Timor President Sees Bright Future if Country

সার্ধশতবর্ষের রঙ্গালোকে বিনোদিনী দাসী

ডঃ নিলয় কুণ্ডু
প্রাণীবিদ্যা বিভাগ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম জাহাজটি জলে ভেসেছে - নাম রেখেছেন 'সরোজিনী'। তাঁর নিজের রচিত সুবিখ্যাত নাটকটির নামে। কাল সকালে যাত্রা শু আজ তাই জাহাজে একটা পারিবারিক অনুষ্ঠান হবে - অনেকেই এসে গেছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজে গিয়ে স্ত্রী কাদম্বরীকে নিয়ে আসবেন জোড়াসাঁকো থেকে কাদম্বরীও পূর্বের সমস্ত দূরত্ব ভুলে নবআনন্দে মেতেছেন, আজ তিনি স্বামীর গৌ গৌরবান্বিত। শেষে রাত এগারোটা বেজে গেলেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এলেন না। সমস্ত পুঞ্জিভূত ক্ষোভ, অভিমান, অগ্রাহ্য, শ্লেষ তাঁকে আবার চরম বিরহিনী তুলল। এবার আর ভাবনা নয় - কাপড়ওয়ালি বিশুর দেওয়া চারটি আফিমের বড়ি কাদম্বরী মরণঘুমের হাওয়ায় ইচ্ছেপাখির ইচ্ছেডানায় ভেসে পড়লেন। পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে লেখা নিজের শেষ চিঠি আর 'প্রানাধিকেষু' কে উৎসর্গিত মেয়েলি হাতের লেখায় লেখা চিঠি যা তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অভিধান ও পেয়েছিলেন।

কাদম্বরীর মর্মান্তিক মৃত্যু ঠাকুরবাড়ির অন্দর বাহিরকে আন্দোলিত ঠিকই তবে রবিঠাকুরের জ্যোতিদাদাকে কে 'প্রানাধিকেষু' বলে চিঠি লিখেছিলে নিয়ে জল্পনা থামেনি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী ব ২১শে এপ্রিল ১৮৮৪এ কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর কারণ ওই তিনটি চিঠি যা তৎ শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর রচনা - জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রিয় 'সরোজিনী', বিনোদিনী দাসীর

বহুচর্চিত বিনোদিনী দাসী আজও বাঙালির কাছে লোক-কথায়, লোক- বেঁচে। ১৫৪ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের খোলার চালের হতদরিদ্র সংসারের মেয়ে বড় একা পুঁটি - মা, দিদিমা আর ভাই, এই তার সংসার। তার খেলার সাথীর স বিয়ে হল বটে, তবে স্বামীকে তার মাসী জোর করে নিয়ে যায়। ভাইয়েরও বি তবে তার অকাল প্রয়াণে পুঁটিকে পুনর্বার একাকিত্ব গ্রাস করে। কর্ণওয়ালিস অবৈতনিক স্কুলে ভর্তি হয় সাত-আট বছর বয়সে। স্কুলের খাতার নাম লে 'বিনোদিনী দাসী'। একই বাড়ির ভাড়াটে 'গোলাপফুল' গঙ্গাবাঈ এর কাছে তালিম নেওয়া শুরু করল পুঁটি। শেষে গঙ্গাবাঈ এর সুপারিশে পূর্ণচন্দ্র মুখোপা ব্রজনাথ শেঠদের হাত ধরে ভুবনমোহন নিয়োগীর 'গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারে' ল বেতনে ভর্তি হল পুঁটি।

শুরু হল পুঁটির বিনোদিনী হয়ে ওঠা। অভিনয় শিক্ষার ভার পড়ল মহেন্দ্রলাল বসুর উপর। ১৮৭৪ সালের ১২ই ডিসেম্বর 'শত্রুসংহার' নাটকে দ্রৌপদীর সখির চরিত্রের সামান্য পার্টই সবাইকে মুগ্ধ করল। প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার কথা বিনোদিনীর ভাষায় - সেই সকল উজ্জ্বল আলোকমালা, সহস্র সহস্র লোকের উৎসাহপূর্ণ দৃষ্টি, এইসব দেখিয়া শুনিয়া আমার সমস্ত শরীর ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিল, বুকের ভিতর দুরু দুরু করিতে লাগিল ..... একে আমি অতিশয় বালিকা, তাহাতে গরিবের কন্যা, কখনও এইরূপ সমারোহপূর্ণ স্থানে যাইতে বা কার্য করিতে পারি নাই।..... আমি ভয় ভয় ভগবানকে স্মরণ করিয়া যে কয়েকটি কথা বলিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলাম..... তাহা বলিয়া চলিয়া আসিলাম। আসিবার সময় সমস্ত দর্শক আনন্দধ্বনি করিয়া করতালি দিতে লাগিল। এমন সহজ উপায়ে সরল মনে অতিসত্য কথাটা বোধহয় বিনোদিনীর পক্ষেই বলা সম্ভব।

পরের নাটক 'হেমলতা' থেকেই পাকাপাকি ভাবে নায়িকার ভূমিকায় তাকে দেখা যেতে লাগল। রাজকুমারী, ক্ষেত্রমনি, লক্ষীমনি, নারায়ণীরা রইলেন পাশে। তবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সরোজিনী'তে বিনোদিনীর অভিনয় এক ইতিহাস সৃষ্টি করল। ১৮৭৬ এর ডিসেম্বর মাসে বিনোদিনী বেঙ্গল থিয়েটারে চলে এলেন। বেঙ্গল থিয়েটারের ১৯ মাসের কার্যকালে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী', 'দুর্গেশ-নন্দিনী' ইত্যাদি নাটকে শরৎচন্দ্র ঘোষ এর তত্ত্বাবধানে নিজেকে ভাবগম্ভীর অন্তর্দ্বন্দ্বদীর্ণ চরিত্রাভিনয়ের উপযুক্ত করে তুললেন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র 'মৃণালিনী', তে বিনোদিনীর অভিনয় দেখে বলেছিলেন - 'আমি মনোরমার চিত্র পুস্তকেই লিখিয়াছিলাম, কখনো যে প্রত্যক্ষ দেখিব এমন আশা করি নাই। আজ বিনোদের অভিনয় দেখিয়া সে ভ্রম ঘুচিল।' ১৮৭৭ সালের শেষে যোগ দিলেন ন্যাশানাল থিয়েটারে গিরীশচন্দ্র ঘোষের তত্ত্বাবধানে। 'মেঘনাদ বধ'-এ বিনোদিনী একাই সাতটি চরিত্রে অভিনয় করেন। গিরীশচন্দ্র, অমৃতলাল বসু ও অমৃতলাল মিত্রের কাছে শিখতে শুরু করলেন পাশ্চাত্য থিয়েটারের অভিনয় ও ভাবধারা; শেক্সপিয়ার, মিলটন, পোপ, বায়রনের মতো কবিদের কাব্যভাবনার বিশ্লেষণ। এই ন্যাশানালেই বিনোদিনী 'বিষবৃক্ষ', 'সধবার একাদশী', 'পলাশীর যুদ্ধ'র মাধ্যমে দর্শকদের বিস্ময়ে পরিণত হলেন। গিরীশচন্দ্র বলেছিলেন - 'আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে রঙ্গালয়ে বিনোদিনীর উৎকর্ষ আমার শিক্ষা অপেক্ষা তাহার নিজগুণে অধিক। সূর্যরশ্মিকে প্রতিফলিত করতে মণিখণ্ডের প্রয়োজন।"

ইতিমধ্যে ন্যাশানাল থিয়েটারের মালিক প্রতাপচাঁদ জহুরীর সঙ্গে বিনোদিনীর মানসিক দূরত্ব বাড়তে শুরু করে। পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে কাশীতে বেড়াতে গিয়ে

একমাস পর বিনোদিনী যখন অসুস্থ শরীরে কলকাতায় ফেরেন তখন প্রতাপচাঁদ [illegible] মাস মাহিনা বন্ধ করে দেন। গিরীশচন্দ্র ও অমৃতলাল বসুর মধ্যস্থতায়, সাময়িক অ[illegible] কাটলেও বিনোদিনীর মনে নিজেদের থিয়েটার খোলার ভাবনা বিস্তৃতি লাভ ক[illegible] থাকে। সেই সময়েই গুর্মুখ রায় নামক মাড়োয়ারী যুবকের আবির্ভাব। বিনোদিনীর [illegible] থিয়েটার গড়তে তিনি টাকা ঢালবেন তবে বিনোদিনীকে তাঁর চাই - এই ছিল [illegible] গিরীশচন্দ্র ও অন্যান্যরা বিনোদিনীকে উৎসাহিত করলেন, তাকে ঠেলে দিলেন [illegible] রায়ের উপপত্নী হিসেবে বাকি জীবন অতিবাহিত করতে। বিনোদিনীর বড় সা[illegible] বিডন স্ট্রিটের নতুন থিয়েটারের নাম হোক বি-থিয়েটার, তার নামানুসারে। [illegible] সেখানেও গিরীশচন্দ্র এবং অন্যান্যরা নিজ স্বার্থ দেখে রেজিস্ট্রির সময় নাম রা[illegible] স্টার থিয়েটার। বিনোদিনী যত বড় অভিনেত্রী হোননা কেন তাদের চোখে [illegible] বারাঙ্গনা ব্যতীত অন্য কিছু নন। আজ অব্দি এই বর্ণময় অভিনেত্রীর সামান্য [illegible] অতিবড় স্বপ্ন হয়েই থেকে গিয়েছে। একটি রাস্তার নামকরণ বিনোদিনীর নামে হ[illegible] আজও কোন রঙ্গমঞ্চ তার নামে করা হয়নি। স্টার-থিয়েটার সম্পূ[illegible] কলাকুশলীদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ছিল। ১৮৮৩ সালের ২১শে জুলাই, 'দক্ষযজ্ঞ' [illegible] দিয়ে স্টার থিয়েটার-এর উদ্বোধন হয়। এই সময় পরম নাস্তিক উন্নাসিক গিরী[illegible] ভক্তিভাবের নাটকগুলি স্টার-এ একে একে পরিবেশিত হতে থাকে - 'ধ্রুব-চরিত্র', [illegible] দময়ন্তী' 'সুরুচি', 'প্রহ্লাদ চরিত্র' ইত্যাদি। ১৮৮৩ সালে গুর্মুখ রায় স্টারের স্বত্ব [illegible] করতে চান বিনোদিনী ও তার মার কাছে কিন্তু এবারও গিরীশচন্দ্র ও অন্যান্য[illegible] সাধলেন। মাত্র ১১ হাজার টাকায় স্টার থিয়েটারের স্বত্ব হস্তান্তরিত হল অমৃতলা[illegible] দাশুচরণ নিয়োগী, অমৃতলাল বসু ও হরিপ্রসাদ বসুর কাছে।

গিরীশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' স্টার-এ অভিনীত হল ২রা অগাস্ট ১৮৮৪ [illegible] গিরীশচন্দ্রের নাটকজীবনী এবং বঙ্গ রঙ্গালয়ের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা আলোড়ন সৃ[illegible] নাটক এই চৈতন্যলীলা। এই নাটকের গান ও সংলাপ সেই সময়ের লোকের মুখে [illegible] হিন্দুসমাজ আবার কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা। মঞ্চে প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং [illegible] আবির্ভূত হয়েছেন যেন। কাজেই এটা সহজেই অনুমেয় শ্রীগৌরাঙ্গ-এর চ[illegible] পুরুষবেশী বিনোদিনী কি অভিনয়টাই করেছিলেন। স্বয়ং রামকৃষ্ণ শিষ্যদের [illegible] দেখতে গিয়েছিলেন সেই অভিনয়। সেদিনকে সেই অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন [illegible] জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক ফাদার লাফোঁ, ব্রাহ্মনেতা বিজয়কৃষ্ণ গোস্ব[illegible] থিয়োসফি আন্দোলনের নেতা কর্ণেল আলকট আর ধন্বন্তরি ডাক্তার মহেন্দ্র[illegible] সরকার। কিশোর নিমাই বেশে বিনোদিনীকে কেউ চিনতে পারেননি। বিনোদি[illegible] 'হরিবোল হরিবোল' গীত ও উদ্দাম নৃত্য রামকৃষ্ণের চোখেও ঘোর লাগিয়েছিল। [illegible]

[illegible] বাহ্যে যাচ্ছিলেন। তিনি শিষ্যদের বলেছিলেন এমন অভিনয় দেখতে [illegible] যদি তিনি ভাব বা সমাধিতে চলে যান, তবে তারা যেন গোলমাল না করেন। [illegible] আগে বিনোদিনী ভাবসাগরে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে অভিনয়ের [illegible] অজ্ঞান হয়ে যান। ডাক পড়ে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের। তিনি গিয়ে [illegible] ক্রিস্টান সাধু ফাদার লাঁফো এক বারবনিতার মাথা হাটুতে তুলে বসে আছেন, ও [illegible] ভিপে দিচ্ছেন বিনোদিনীকে চাঙ্গা করবার জন্য। সে তখনও যেন কৃষ্ণ উন্মাদিনী [illegible] মুখে তখনও 'শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ'। এমন ভাবে মন প্রাণ ঢেলে অভিনয় প্রতিষ্ঠা [illegible] সহজ নয়। তাঁর জীবনের অনেক উত্থান পতন, অনেক দ্বন্দ্ব, অনেক অবহেলার, [illegible] প্রতিশ্রুতিভঙ্গের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার এই রাস্তাটাই বিনোদিনী বেছে [illegible]লেন। অনেক পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলেও শ্রীকৃষ্ণকেই তিনি তাঁর মন, প্রাণ, [illegible] নিবেদন করেছিলেন। তাঁর বাড়িতে ছিল শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি যাঁর সামনে বসে গানের [illegible] তাঁর আরাধ্য দেবতাকে তাঁর সুখ-দুঃখের সাথী করে নিতেন।

রামকৃষ্ণ ঠাকুর চৈতন্যলীলা দেখতে দেখতে দু-তিনবার ভাব সমাধিতে [illegible]ছিলেন। প্লে-এর শেষে রামকৃষ্ণ ঠাকুর গেলেন বিনোদিনীর সাথে দেখা করতে [illegible] এক সাংঘাতিক কাণ্ড করে ফেললেন। তিনি 'গৌরহরি গৌরহরি' বলতে বলতে [illegible] গেলেন বিনোদিনীর কাছে এবং কান্না মিশ্রিত গলায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিনোদিনীর [illegible] ওপর। একজন বারবনিতার কোন সাধকের পা স্পর্শ করে প্রণাম করার অধিকার [illegible], আর এতো উলটো পুরাণ, তাই ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে বিনোদিনী প্রভুর আশীর্বাদ [illegible]ছিলেন। রামকৃষ্ণ তাঁর মাথায় দুহাত রেখে বলেছিলেন - 'মা তোমার চৈতন্য হোক, [illegible] তো আসল নকল এক দেখলাম।' রামকৃষ্ণের সঙ্গে বিনোদিনীর আরও কয়েকবার [illegible] হয়। রামকৃষ্ণ তখন কর্কট রোগে আক্রান্ত। অসুস্থ হওয়ার আগেও রামকৃষ্ণ [illegible] চরিত্র", "বিল্বমঙ্গল" ইত্যাদি পালা দেখেছেন এবং গ্রিনরুমে বিনোদিনী ও [illegible] নটনটীদের আশীর্বাদও করেছেন. তাই অসুস্থতার খবরে বিনোদিনী মনোকষ্টে [illegible]লেন। আবার সরাসরি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গেলে লোকসমাজে আরও নিন্দিত হবেন [illegible] ভয়ে যেতেও পারছিলেন না। অবশেষে কালী ঘোষ মহাশয়ের সাথে তার বন্ধু [illegible], নিখুঁত বিলাতি পোষাক, মাথায় টুপি ও চোখে রিমলেস চশমা পরে নিজেকে [illegible] বদলে, শ্যামপুকুরে নিজে পরমহংসদেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। [illegible]মহংসদেব স্বর শুনে চিনতে পারলেন এবং খুব মজা পেলেন এবং রোগজর্জর [illegible]রের দুঃখ বেদনা ভুলে হাসতে থাকলেন। তবে অপর প্রান্তে বিনোদিনী ঠাকুরের [illegible]ক্লিষ্ট শরীর দেখে কেঁদে রামকৃষ্ণের পা ভিজিয়ে দিলেন।

আস্তে আস্তে স্টার থিয়েটারে বিনোদিনী বুঝলেন তাঁর সময় শেষ হয়ে এসেছে।

সহকর্মীদের কাছেও ন্যূনতম সম্মান পাচ্ছেন না। ১৮৮৭ সালের ১লা জানুয়ারী
বাজার'। নাটকটি বিনোদিনী শেষবার অভিনয় করেন। তার পর স্টার এর
প্রায় কুড়িদিনের সফরে বেরোলেন। তবে বিনোদিনী তাতে যোগ দিলেন না।
ঐতিহাসিকরা বলেন সেই সময় বিনোদিনীর শ্বেতী দেখা যায় ঠোটের নিচে।
তিনি চড়া মেকআপও নিতেন সবসময়ে। সফর শেষ করে সকলে ফিরে
বিনোদিনী আর স্টারে ফিরলেন না। সেইদিন ছিল বড়ই দুঃসহনীয়। তাই লিখেছিলে
"থিয়েটার ভালবাসিতাম, তাই কার্য করিতাম, কিন্তু ছলনার আঘাত ভুলিতে পারি
তাই অবসর বুঝিয়া অবসর লইলাম।'

বিনোদিনী বিয়ে দেওয়া হয়েছিল মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তাঁর খেলার সাথী
সঙ্গে । কিছুদিনের মধ্যেই তার মাসী শাশুড়ি তাকে নিয়ে যায় এবং বহু
লোকপরম্পরায়, বিনোদিনী শুনেছিলেন তাঁর স্বামী পুনর্বিবাহ করে সংসারে মজেছে
থিয়েটার জীবনের প্রথমদিকে বিনোদিনীর এক পুরুষ সঙ্গী ছিলেন। যার নাম
কোথাও উল্লেখ করেননি। বড়ই প্রেমের ছিল সেই সম্পর্ক। এই বিশেষ পুরুষ
অনুপস্থিতিতে বিনোদিনীকে চলে যেতে হয় গুর্মুখ রায়ের অধিকারে।
ঐতিহাসিকরা বলেন গুর্মুখকে গ্রহণ করবার আগেই বিনোদিনী অন্তঃসত্তা ছিলে
ইতিমধ্যে বিনোদিনীর প্রাক্তন অনাশ্মী বাবুটি ফিরে আসেন এবং প্রচুর টাকা দিয়ে
কিনতে চান। এতে বিনোদিনীর আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। তিনি বলেন -'রাখ
টাকা, টাকা আমি উপার্জন করিয়াছি বই টাকা আমাকে উপার্জন করে নাই।' এতে
বাবুটি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে তরবারি দিয়ে বিনোদিনীকে খুন করবার চেষ্টা করেন।
বিনোদিনী আত্মগোপন করলেন রাণীগঞ্জে, সেখানেই জন্ম হল তাঁর প্রথম
সন্তানের, তবে তাকে বাচাতে পারলেন না। এরপর গুমুর্খও চলে যায় তাঁর
থেকে। এরপর বিনোদিনীর সঙ্গে পাকাপাকি ভাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সম্পর্ক
এবং পারিপার্শ্বিক সময়কালীন অবস্থান বিচার করলে তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা শকুন্তল
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঔরসজাত তা বলা যেতে পারে। ১৮৯০ থেকে ১৯১২ সাল
বিনোদিনী বধুর সম্মান পান - এমন কি শকুন্তলাকেও কন্যার মর্যাদা দিতে চেয়েছি
সেই পুরুষ। সেইসময় ধনী জমিদার পুত্রদের - নিজেদের দখলে বারবনিতা রাখাটাই
প্রচলিত প্রথা - আর যদি থিয়েটারের কোন রসময়ী অভিনেত্রী হন তাহলে তো
নেই। তাই বিনোদিনীর মতো অতি আধুনিকা নারীকেও তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সম
বিত্তবান পুরুষদের পসরা হয়ে থাকতে হয়েছে। এমনকি নানা ছলাকলায়
স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিনোদিনীকে পণ্যে রূপান্তরিত করার চেষ্টাও করেছিলেন অনে
তবে দেরীতে হলেও বিনোদিনী পেয়েছিলেন তাঁর মনের, কাছের মানুষটিকে

[illegible], একমাত্র যিনি তাঁকে পূর্ণ সামাজিক নারীর ও বধূর মর্যাদা দিয়েছিলেন। [illegible]-১৯৪২-এর মধ্যে নিজের নারীসত্তাকে, বিনোদিনী থিয়েটার ছাড়াও লেখনীয় [illegible] উদ্ভাবিত করেছিলেন। তাঁর সৃষ্ট আত্মজীবনীতে তিনি সমাজের প্রতি তীব্র কটাক্ষ [illegible]। এবং কঠোর ভাবে সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থাকে বিদ্ধ করেছেন। এছাড়াও [illegible], 'কনক' ও 'নলিনী' ইত্যাদি বহু কাব্যপন্যাস-এর রচয়িতা তিনি। তাঁর বহু গান [illegible] 'কাকলী', 'বীণার ঝঙ্কার' নামে স্থান পেয়েছে।

পরিশেষে তাঁর মা হয়ে ওঠা বড়ই দুঃখের। ১৯০৪ সালে মারা যায় একমাত্র কন্যা শকুন্তলা। যে শকুন্তলাকে তিনি স্কুলে ভর্ত্তি করে পড়শুনা করাতে পারেননি। সমাজের পবিত্রতা রক্ষার দোহাই দিয়ে নীতিবান পুরুষেরা তাঁর কন্যার শিক্ষা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাই এই অতিআধুনিকা নারীর জীবন সংগ্রাম শুধুমাত্র কলকাতার রঙ্গালয়ে নিজের 'নিকষিতহেম' যৌবন মেলে ধরাই একমাত্র লক্ষ্য ছিল না, তাই এলোকেশী, গোলাপসুন্দরী, বসন্তকুমারী, হরিমতি, শশীমুখী, জগত্তারিনী ইত্যাদির মধ্যেও বিনোদিনী দাসী সম্পূর্ণ আলাদা ও অনান্যা। তবে আজও তিনি নটী বিনোদিনী নামেই খ্যাত হয়ে রইলেন - বিনোদিনী দাসী হয়ে উঠলেন না আমাদের কাছে।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১. প্রথম আলো - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

২. আমার কথা ও অন্যান্য রচনা - বিনোদিনী দাসী

৩. বাংলার নটনটী - দেবনারায়ণ গুপ্ত

৪. রঙ্গালয়ে বঙ্গনটী - অমিত মৈত্র

বৌদ্ধ দর্শনে পারমিতার ভূমিকা

অধ্যাপিকা জয়িতা দত্ত
দর্শন বিভাগ

বিশ্বের দর্শনের ইতিহাসে এমন দার্শনিক একজনই দেখা যায় যিনি... গড়তে গিয়ে একটি অভিনব ধর্ম প্রবর্তন করেন। তিনি হলেন গৌতম ... তাঁর জীবন যেমন বিস্ময়কর, তাঁর নৈতিক প্রভাব ও তেমন বিশ্বের ইতিহাসে এক... দীর্ঘ কালব্যাপী বিস্ময়কর ব্যাপার। তিনি শুধু ভারতের নন পৃথিবীর ... দেশের মানুষের কাছেও পরম শ্রদ্ধেয়।

ভগবান বুদ্ধ জটিল ও তত্ত্ব বিদ্যার গহনে প্রবেশ করেননি, দার্শনি... আলোচনা ছিল তাঁর মতে নিস্ফল, তিনি বলেছিলেন - মানব জীবনের লক্ষ্য হ... নির্বান বা মুক্তিলাভ বা ত্রিধিব দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। নিজ অভিজ্ঞ... থেকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, মধ্যপন্থাই নির্বান লাভের উপায়। অসার... ভোগবিলাস দ্বারা যেমন মানুষ নির্বান লাভ করতে পারে না, তেমনি কৃচ্ছসাধ... দ্বারাও মানুষ পরম মঙ্গল লাভ করতে পারে না। যদিও বুদ্ধদেব মধ্যপন্থার ... বলেন তবু তিনি তাঁর অনুশীলনের মধ্যে উদারতাকে প্রাধান্য দেন।

গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে জন্ম জন্মান্তর ধরে যে সমস্ত সৎকা... অনুষ্ঠান করেছিলেন তাকে এক কথায় 'পারমিতা' (পরম + ই + তা) বলা ... 'পারমিতা' বলতে আবার পূর্ণতা, সম্পূর্ণ অনুভূতি, দুঃখমুক্তির পারে উত্তীর্ণ হওয়া... চর্যা, যে সৎ কর্মাদির অনুষ্ঠান তাকেও বোঝায়।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রাথমিক অবস্থায় দশ প্রকার 'পারমিতার' উল্লেখ আছে কিন্তু ... গ্রন্থাদিতে ছয় প্রকার পারমিতার উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ধর্মের প্রাথমিক অ... **বুদ্ধবংসে** যে দশ প্রকার পারমিতার উল্লেখ করা হয়েছে তা হল- ১) দান ২) শীল ... নৈস্কাম্য ৪) সত্য ৫) ক্ষান্তি ৬) বীর্য ৭) অধিষ্ঠান ৮) মৈত্রী ৯) উপেক্ষা ১০) প্রজ্ঞা... মহাযান গ্রন্থাদিতে যে ছয় প্রকার পারমিতার উল্লেখ করা হয়েছে তা হল - ১) দান ... শীল ৩) ক্ষান্তি ৪) বীর্য ৫) ধ্যান ৬) প্রজ্ঞা।

বুদ্ধবংসের দশ প্রকার পারমিতা গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে তাদের... মহাযান এর ছয় প্রকার পারমিতার অন্তর্ভুক্ত করা যায় নৈস্কাম্য অর্থাৎ কাম ভোগের প্র... চিত্তকে নমিত না করা, সত্য এবং শীলের অতিরিক্ত কিছু নয়। অতএব এই তিনটিকে... মহাযানের শীল পারমিতার অর্ন্তভুক্ত করা যায়। মৈত্রী এবং উপেক্ষা ধ্যান ব্যতীত ... নয় কাজেই ঐ দুটিকে মহাযানের ধ্যান পারমিতার অর্ন্তভুক্ত করা যায়। অধিষ্ঠান ব...

বীর্যের অর্ন্তভুক্ত করা যায়।

উক্ত ছয় পারমিতার অতিরিক্ত উপায়, প্রণিধান, বল এবং জ্ঞান পারমিতার চর্চা ও সম্প্রদায় এ দেখা যায় এদের মধ্যে জ্ঞানকে প্রজ্ঞা-পারমিতার অর্ন্তভুক্ত করা উপায়, প্রণিধান (সংকল্প) এবং বল ও বীর্যের অতিরিক্ত নয়।

আর্য অসঙ্গ তাঁর মহাযান সূত্রালংকারে (১৬/১৩) ছয় প্রকার পারমিতার মাহাত্ম্য করেছেন। যেমন -- দান পারমিতা দারিদ্র দূর করে। শীল পারমিতা বিষয় নিমিত্তক অগ্নিকে শীতল করে। ক্ষান্তি পারমিতা ক্রোধ ও বিদ্বেষকে ক্ষয় করে। বীর্য পারমিতা শ্রেষ্ঠ বা কুশল ধর্মের সঙ্গের চিত্তকে যুক্ত করে। ধ্যান --পারমিতা চিত্তকে ধারণ করতে সাহায্য করে। প্রজ্ঞা-- পারমিতার দ্বারা পারমার্থিক জ্ঞান লাভ হয়।

বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনে পারমিতার গুরুত্বকে বুঝতে গেলে জানা প্রয়োজন এই পারমিতা সমূহের মধ্যে কোন সত্য বিধৃত রয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মে বলা হয়েছে দান-পারমিতা উদারতা বা ঔদার্যে সম্পূর্ণতা নিয়ে আসে। এই পারমিতা হল উদারতা, মহত্ত্বতা, দানশীলতা ও ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই পারমিতার সারধর্ম হল সমস্ত জগতের বন্ধন ও আকাঙ্খা মুক্ত হয়ে নিঃশর্ত ভালোবাসা, নিঃস্বার্থ দানশীলতা এবং মহত্ত্বতার পরিচয় দেওয়া। সর্ব প্রাণীর হিতের জন্য নিজের সর্বস্ব দান করা, এমন কি নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা সমস্ত শরীর নিঃস্বার্থভাবে দান করা এবং দানের ফলও ত্যাগ করা দান পারমিতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। অনুশীলনের অন্যতম ধাপ হল দানশীলতা। আমাদের দানশীলতা হবে নিঃসর্ত ও নিঃস্বার্থ এবং নিজের স্বার্থ পূরণের জন্য কাউকে কৃতজ্ঞতা, স্বীকৃতি, সুযোগ, সুবিধা, ক্ষতিসাধন বা কোন পুরস্কার প্রদান করা যাবেনা। দানের পর যদি ফলের আকাঙ্খা থাকে তাহলে সেই দান শুদ্ধ হয় না তা বন্ধনের কারণ হয় ও অপূর্ণ থেকে যায়। দানশীলতা কারোর গ্রহণ করার যোগ্যতা বা অযোগ্যতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে না।

পারমিতার উদারতা প্রতিপন্ন করার জন্য আমাদের বিচক্ষণতার সাথে গভীরভাবে পারমিতা অনুশীলনের উপকারিতা এবং কৃপণতা বা লোভের অপকারিতা চিন্তা করা উচিৎ। জগতের ধ্রুব সত্য হল - দেহ ও পার্থিব সম্পদ অস্থায়ী। তাই বোধিসত্ত্বগণ নিজের শরীর পর্যন্ত প্রাণীর হিতের জন্য দান করেন। সাংসারিক দুঃখের মূল হল সর্বপরিগ্রহ। আমার পুত্র, আমার ধন ইত্যাদি আমার আমার করে অজ্ঞ লোক দুঃখ ভোগ করে। নিজেই যখন নিজের নয় তখন পুত্রকন্যা ধনজন কি করে নিজের হবে? এই স্মরণ থাকলে সমস্ত সাংসারিক দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ব্যক্তি তার দৈহিক অপার্থিব সম্পদ সর্বসাধারণের সেবার্থে ব্যবহার করবে।

উদারতার সম্পূর্ণতা হল লোভজনিত, কৃপনতাজনিত ও কোন কিছু অধিকার

করার ইচ্ছা জনিত পীড়া থেকে মুক্তির ঔষধ স্বরূপ। দানশীলতা অনুশীলনের
আমরা আমাদের সময়, উৎসাহ, অর্থ, খাদ্য , পোশাক, অপরকে দান করতে
অন্যদের এই কর্মে আগ্রহী করবে। অমূল্য সম্পদ স্বরূপ ধর্ম উপদেশ ও বুদ্ধদেবে
নীতির ব্যাখ্যা করতে পারি। এর দ্বারা আমরা অন্যদের ভুল দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন
পারি যা ভুল বোঝাবুঝি, পীড়া, এবং দুঃখের সৃষ্টি করে। বোধিসত্ত্বের দান প
উদ্দেশ্যই হল প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করা, তার অভাব দূর করা। কারণ ধনাভাব
চৌর্য, হত্যা, মিথ্যা ভাষণ, ব্যাভিচার, অতিলোভ, কটূভাষণ, মিথ্যা দৃষ্টি, গুরুজনে
দুর্নীতি আসে।

শীলপারমিতাকে বর্ণনা করে বলা হয়েছে এই পারমিতা অনুশীলনে নৈতিক
সম্পূর্ণতা সম্ভব হয়। এই পারমিতা হল ধার্মিকতা, নৈতিকব্যবহার, নৈতি
আত্মনিয়মানুবর্তিতা, সম্মান, ও ক্ষতিকরহীনতার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত
পারমিতার সারধর্ম হল আমরা আমাদের ভালবাসা ও সহানুভূতির মাধ্যমে অন্য
ক্ষতি করতে পারি না। আমরা আমাদের চিন্তা ভাবনা কথাবার্তা ও কাজকর্মে
ধার্মিকতা ও ক্ষতিকরহীনতার পরিচয় দেব। ধ্যানের অনুশীলনের ক্ষেত্রে ও
উচ্চতর অনুভূতির প্রতি মনোযোগের ক্ষেত্রে এই নৈতিক ব্যবহারগুলির অনু
উন্নতির উৎস স্বরূপ। নৈতিকতার অনুশীলনের দ্বারা উদারতার অনুশীলন সমৃ
এবং তা উদারতার স্থায়ী ফলাফলকে নিশ্চিত করে।

আমাদের খারাপ আচরণগুলি ত্যাগের মাধ্যমে ও বোধিসত্ত্বের নৈ
আদেশগুলি অনুশীলনের মাধ্যমে আমরা আমাদের ব্যবহারে নিষ্কলঙ্ক
মিথ্যাবাদিতা, হত্যাকরা, চুরিকরা, যৌন অব্যবহার, বিচ্ছিন্নতাবাদী বক্তব্য, কটূবা
গল্পগুজব করা, অতিরিক্ত লোভ, দ্বেষ, এবং ভুল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদের
থাকতে হবে। আমরা এই নৈতিক শিক্ষাগুলি অনুসরণের মাধ্যমে স্বাধীনতা,
এবং জীবনের নিরাপত্তা অনুভব করি। কারণ আমাদের নৈতিক ব্যবহারের
আমরা নিজেদের বা অপরের দুঃখের কারণ সৃষ্টি করিনা। আমরা অবশ্যই বুঝতে
যে অনৈতিক ব্যবহারের দ্বারা দুঃখ এবং আনন্দহীনতা সৃষ্টি হয়।

নৈতিক আচরণের উপকারিতা ও অনৈতিক আচরণের অপকারিতা কে
করে তুলতে পারলে নৈতিকতা অনুশীলনের ক্ষেত্রে মানুষকে আরো উৎসাহী
তোলা যাবে। শীল পারমিতা (নৈতিকতার সম্পূর্ণতা) অনুশীলনের মাধ্যমে
সমস্ত খারাপ চিন্তা ভাবনা থেকে দূরে থাকি। শুধুমাত্র আমাদের কাজকর্মের মাধ্য
নয়, আমাদের কথাবার্তা এমন কি চিন্তার দ্বারাও আমরা কারোর ক্ষতি করতে পারি।
আমাদের কথাবার্তা হতে হবে দয়ালু ও সহানুভূতি সম্পন্ন এবং আমাদের চিন্তা ভা

লোভ, দ্বেষ, এবং ভুল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। এই পারমিতা অনুশীলনের ফলে নৈতিকভাবে দুর্বল ব্যক্তি হয় দৃঢ়চেতা, চাপবিহীন ও আনন্দিত কারণ সে কোন হীন কাজের সাথে যুক্ত হয় না এবং আত্মসম্মান বজায় রেখে সকলের ভালো করা ও সকলকে আনন্দিত করার চেষ্টা করে।

ক্ষান্তি পারমিতা সাধকের জীবনকে ধৈর্য্যের সম্পূর্ণতা প্রদান করে। ক্ষান্তি পারমিতা হল সহিষ্ণুতা , তিতিক্ষা এবং গ্রহণযোগ্যতার একটি উল্লেখযোগ্য সম্মিলন। এই পারমিতার উদ্দেশ্য হল বুদ্ধি এবং মানসিক শক্তির মাধ্যমে আমরা আমাদের স্থৈর্য বা শান্তি না হারিয়ে সমস্ত রকম সমস্যার সমাধান আমরা কিভাবে করতে পারব তার শিক্ষা দেওয়া। সকল মানুষের দুভার্গ্য, অপমান, দুঃখ-দুর্দশাকে আমরা ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা দিয়ে আলিঙ্গন করব ও সমস্ত প্রকার বিদ্বেষ, বিরক্তি ও প্রতিশোধেব মনোভাব ত্যাগ করে তাদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করব। সমস্ত প্রকার সমালোচনা, ভুল বোঝাবুঝি ও মতভেদের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ভালোবাসা ও সহানুভূতি দেখাবো।

ধৈর্য্যের এই উল্লেখযোগ্য গুণের দ্বারা আমরা প্রশংসা, সম্পদ, আনন্দময় পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত আনন্দিত হব না । আবার অপমান, কটূবাক্য, দারিদ্র প্রভৃতিতে অতিরিক্ত দুঃখিত বা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়বো না। সকলের ভালো করার জন্য আমাদের অবশ্যই ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্যের পরিচয় দিতে হবে যার দ্বারা আমরা শান্তিতে থাকতে পারব এবং অন্যকেও শান্তি দিতে পারব। এই ধরনের ধৈর্য্য ছাড়া আমরা কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারব না। বোধিসত্ত্ব প্রাপ্তির চরম পথ ধৈর্য্যের মাধ্যমে এটাই প্রতিষ্ঠিত হয় যে অন্যের দ্বারা দৈহিক, মানসিকভাবে আঘাত গ্রস্থ হলেও বিরক্তি বা রাগের পরিচয় দেব না। আমরা সর্বদা সকলের মধ্যে ভালো এবং সুন্দর জিনিসকে দেখার চেষ্টা করব, আমরা ধৈর্য্য ও কোমলতার মাধ্যমে সকলকে দুঃখের সমুদ্র পার করতে সাহায্য করব। সকল পরিস্থিতিতে আমরা নিজেদের ধৈর্য্য স্থির রেখে নিজের ও অপরের শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করব। ধৈর্য্য শক্তির মাধ্যমে আমরা ধর্ম অনুশীলনে আমাদের চেষ্টা ও উৎসাহ প্রয়োগ করতে পারব। এভাবে ধৈর্য্যের অনুশীলনের মাধ্যমে পরবর্তী পারমিতা বীর্যের ও উন্নতি ঘটাতে পারব।

বীর্য পারমিতা আনন্দমূলক বা উৎসাহমূলক প্রচেষ্টার সম্পূর্ণতা দেয়ঃ

এই পারমিতা হল প্রাণশক্তি, জীবনীশক্তি, সহ্যশক্তি, অধ্যবসায়, গভীর আগ্রহ, ধারাবাহিক ও স্থায়ী চেষ্টার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। কুশল কর্মে উৎসাহিত হওয়াই বীর্য, এর বিপরীত হচ্ছে আলস্য, কুৎসিৎ কর্মে আসক্তি, বিষাদ এবং আকাঙ্খা। সংসার দুঃখ তীব্রভাবে অনুভূত না হলে কুশল কর্মে প্রবৃত্তি হয় না, আবার সংসার দুঃখ অনুদ্বেগ হেতু আলস্য উৎপন্ন হয়। উদ্যমের সময় যে উদম্যবিহীন, তরুণ ও শক্তিমান হয়েও যে

আলস্যযুক্ত, সংকল্পে অবসন্ন চিত্ত, হীনবীর্য, নিরুৎসাহী সেই ব্যক্তি প্রজ্ঞামার্গ
করতে পারে না।

বীর্য বলতে বোঝায় পুণ্যাচরণের জন্য উৎসাহ। সমস্ত দুঃখের মূল হল ক্লে
(চিত্ত)। এই ক্লেশ সমূহকে বীর্যসহকারে নির্মূল করতে হবে। স্মৃতি ভ্রষ্ট হলে লো
একটার পর একটা ভুল করে ও পরে অনুশোচনা করে । অতএব বীর্য সহকারে স
স্মৃতিকে জাগ্রত রাখতে হবে। প্রথম তিনটি পারমিতা উদারতা, নৈতিকতা, ধৈর্যের
আমাদের প্রয়োজন পারমিতা অনুশীলনের। এই পারমিতা অনুশীলনের মাধ্যমে অ
আগের পারমিতাগুলি আরো যথাযথ ভাবে অনুশীলন করি ও জীবনে নৈতিক উৎ
ও আনন্দের বিকাশ ঘটে।

এই পারমিতার সারধর্ম হল সাহস, শক্তি এবং ধর্ম অনুশীলনের জন্য স
সহ্যশক্তি ও সকল প্রাণীর জন্য সবচেয়ে ভালো করার চেষ্টা করা। কোন প্রকার প্রশংস
পুরস্কারের আশা না করে আমরা সর্বদা আমাদের দৈহিক, মানসিক, আচরণ
কথাবার্তার মধ্য দিয়ে সকলের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করব। আমাদের সর্বোচ্চ দক্ষ
দিয়ে আমরা সর্বদা অপরের সেবা করার জন্য প্রস্তুত থাকব। উৎসাহে কোন প্র
আলস্য না দেখিয়ে উদ্যমসূচক প্রচেষ্টা ও ত্যাগের উৎসাহ দিয়ে আমরা সর্বদা অপ
সেবা করার জন্য প্রস্তুত থাকব। বীর্য পারমিতার উন্নতি সাধন না করলে যে
প্রতিকূল ঘটনার সম্মুখীন হলে আমরা আমাদের অনুশীলন ত্যাগ করতে পারি।

'বীর্য' শব্দটির অর্থ হল সমস্ত প্রকার মোহমুক্তির জন্য অধ্যবসায় ও ঐকান্তিক
এবং সর্বোচ্চ জ্ঞান লাভের জন্য উৎসাহমূলক প্রতিযোগিতা। যখন আমাদের মনে
অধ্যবসায় ও ঐকান্তিকতা আসে তখন আমাদের মন হয় দৃঢ় ও শুদ্ধ চেতা। আম
ধর্মের অনুশীলনের চরম মূল্য বা উপকারিতা আছে বলেই আমাদের অধ্যবসায়
প্রচেষ্টার সাথে অনুশীলন করতে হবে। নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে এই পারমি
প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে আমরা আমাদের আত্মবিশ্বাসের উন্নতি করতে পারব
আমাদের একটি উল্লেখযোগ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। এই পারমি
অনুশীলনের মাধ্যমে আমরা ব্যর্থতাকে সাফল্যের ধাপ , বিপদকে সাহসীকতার উৎ
এবং দৈহিক বা মানসিক কষ্টকে জ্ঞান ও সহানুভূতি অনুশীলনের সুযোগ হিসাবে দে
আমাদের চরিত্রের দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস ও উৎসাহপূর্বক ঐকান্তিকতার মাধ্যমে স
পারমিতা পালন করতে হবে।

ধ্যান পারমিতা নিয়ে আসে মনোযোগের সম্পূর্ণতা ঃ

এই পারমিতা হল মনোযোগ, ধ্যান, সমাধি, মানসিক দৃঢ়তার উল্লেখযোগ্য
আমাদের মনের কাজ হল সর্বদা বিশ্রামহীনভাবে একটা ভাবনা থেকে আর একটা ভা

চলা । বীর্যকে বৃদ্ধি করে সমাধিতে মন আরোপ করতে হবে অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতার জন্য যত্নবান হতে হবে। কারণ যার চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকে সে বীর্যবান হলেও ক্লেশ কবলিত থাকে।

'ধ্যান' শব্দের অর্থ হচ্ছে সমাধি যার অর্থ হল চিত্তের একাগ্রতা। সমাধিতে সকল প্রকার বাহ্য চিন্তা নাশ হয়। জনসম্পর্ক বা কামাদি ত্যাগ না হলে মন সমাধিতে নিবিষ্ট হয় না। স্নেহের বশীভূত তথা লাভ সৎকার দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে সংসার ত্যাগ করা যায় না। জ্ঞানী ব্যক্তির জানা উচিৎ, যিনি চিত্তের একাগ্রতার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনিই চিত্তের ক্লেশাদির মূল উৎপাটন করতে সক্ষম হন, এইরূপ চিন্তা করে প্রথমেই চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনের চেষ্টা করতে হবে। যিনি সমাহিত চিত্ত এবং যাঁর যথাভূত তত্ত্ব জ্ঞান লাভ হয়েছে তাঁর বাহ্য চেষ্টার বিবর্জন হয় এবং শান্ত হওয়ার কারণে তাঁর চিত্ত চঞ্চল হয় না।

সমাধি অনেক প্রকার । কিন্তু এখানে কেবল লৌকিক সমাধির কথাই বলা হয়েছে। কাম, রূপ ও অরূপ ভূমির কুশল চিত্তের একাগ্রতাকে লৌকিক সমাধি বলা হয়। লোকোত্তর সমাধির ভাবনা প্রজ্ঞা ভাবনাতেই সংগৃহীত। প্রজ্ঞা সুভাবিত হলে লোকোত্তর সমাধি লাভ হয়। এই লৌকিক সমাধির মার্গকে বলা হয় "শমথ যান" এবং লোকোত্তর সমাধির মার্গকে বলা হয় 'বিপস্যনা যান'।

ধ্যান পারমিতা বা মনোযোগের সম্পূর্ণতার অর্থ হল আমাদের মনকে এমন ভাবে শিক্ষিত করা যার ফলে আমরা যা চাই আমাদের মনও তা করে। আমাদের মন এবং অনুভূতি গুলিকে শান্ত করতে পারি ধ্যানের মাধ্যমে এবং সমস্ত কিছুতে বুদ্ধিমত্তা ও সচেতনতার পরিচয় দিতে পারি। যখন আমরা মনকে এভাবে শিক্ষা দিই তখনই শারীরিক, মানসিক অস্থিরতা দূর হয়ে যায়। তার ফলে আমাদের স্থৈর্য্য ও প্রশান্তি প্রাপ্তি হয়, এইভাবে মনসংযোগ ঘটানো ও মনকে কেন্দ্রীভূত করার ফলে মনে নির্মলতা, মানসিক সাম্য ও উজ্জ্বলতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রজ্ঞা-পারমিতা সাধকের জীবনে এনে দেয় জ্ঞানের সম্পূর্ণতা। এই পারমিতা হল অতীন্দ্রিয় জ্ঞান, অর্ন্তদৃষ্টি এবং বোধগম্যতার সম্পূর্ণতার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। এই পারমিতার সারধর্ম হল সর্বোচ্চ জ্ঞান, সর্বোচ্চ বোধগম্যতা যা সকল মানুষ বিনা বাক্য ব্যয়ে কোন কিছুর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে গ্রহন করে। প্রজ্ঞা পারমিতা হল সর্বোচ্চ জ্ঞানের উৎস যা সকল বস্তুর শূন্যতা ও আর্ন্তযোগাযোগ সূত্রের কথা বলে। ইহা সামান্য সম্বন্ধে সকল ভুল তথ্যকে বর্জন করে। জগতে যা কিছু দৃশ্যমান তা যে অনিত্য তা এর মাধ্যমে জানতে পারি। প্রজ্ঞা পারমিতা ধ্যান ও সঠিক বোধগম্যতার ফল স্বরূপ। প্রজ্ঞা পারমিতার দ্বারা এটাই বোঝা যায় যে আমরা কেবল নিজেদের ভালো হওয়ার জন্য ভালো কাজ করবো না অপরেরও যাতে ভালো হয় সে কাজ করব। এই ভালো করার

মধ্যে কোন অহংবোধ কাজ করবে না। এই সম্পূর্ণ জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা গ্রহণ বর্জন, আশা ও ভয়, দ্বৈত চিন্তাভাবনার বাইরে চলে যাব।

বোধিসত্ত্ব এই সকল পারমিতার অভ্যাস কালে দান পারমিতার দ্বার প্রতি অনাসক্ত হন, শীল- পারমিতার দ্বারা কায়-বাক্‌কর্মের সংযমের প্রতি ক্ষান্তি পারমিতার দ্বারা প্রাণী বা অপ্রাণী প্রদত্ত দুঃখের দ্বারা অবিচলিত পারমিতার দ্বারা পুণ্যকর্ম সম্পাদনে ক্লান্ত হন না, ধ্যান পারমিতার দ্বারা চিত্ত ও স্থৈর্য্য লাভ করেন, প্রজ্ঞা পারমিতার দ্বারা বুঝতে পারেন যে সংসারে অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম।

বৌদ্ধ ধর্মে বলা হয়েছে এই ছয় প্রকার পারমিতা অনুশীলনের দুঃখের সমুদ্র (সংসার) পার করতে পারি আনন্দের সমুদ্র এবং জাগরণ মাধ্যমে। পারমিতা অনুশীলনের মাধ্যমে অজ্ঞতা এবং প্রবঞ্চনা থেকে পারি। ছটি পারমিতার প্রত্যেকটি মনের আলোকিত গুণ, একেকটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য - সম্পূর্ণ অনুভূতির বীজ আমাদের মধ্যে থাকে। পারমিতাগুলি হল চরিত্রের মূল ধর্ম বা সারধর্ম। এই ধরনের হৃদয়ের আলোকিত গুণগুলি স্বার্থপরতা দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। অবশ্যই এই অব্যক্ত গুণগুলিকে বলতে হবে। এইভাবে ছটি পারমিতা হল অন্তরঙ্গ অনুশীলন, রীতি, সহানুভূতি উজ্জ্বল জীবনের অনুশীলন। ছটি পারমিতা বলতে বোঝায় অপরের ভালো তাদের জীবনকে উজ্জ্বল করা। এটি হল বোধিসত্ত্ব লাভের পথ -বোধিসত্ত্ব বোঝায় যিনি নিজের সমস্ত সেবা দান করেন সমস্ত মানুষের সেবার জন্য সচেষ্ট নিয়ে নিঃশর্ত ভালোবাসা, দক্ষতাসম্পন্ন জ্ঞান দিয়ে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় বৌদ্ধ ধর্মে পারমিতার ভূমিকা কী পারমিতার সচেতন অনুশীলন সাধককে ধীরে ধীরে এগিয়ে দেয় বোধি প্রাপ্তির পারমিতা সমূহের বিস্তৃত আলোচনা থেকে আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে যায়- সেটি হল এই যে পারমিতায় যে সমস্ত নৈতিক বিধান দেওয়া হয়েছে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত যা সাধকের জীবনে নিয়ে আসে সার্বিক পরি বুদ্ধদেব বার বার বলেছেন কোন নৈতিক উপদেশ প্রদান করা তাঁর উদ্দেশ্য ছি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনচর্যার প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের পরিশোধন এবং দিয়ে সঠিক মানুষ গড়ে তোলাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। বুদ্ধদেবের এই লক্ষ্য বা উদ্দে পারমিতার সাথে সত্যিকার অর্থেই সঙ্গতিপূর্ণ তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়।

তথ্য সংকলনঃ

১। গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন। ডঃ সুকোমল চৌধুরী

Omega-3 Fatty Acids – an essential element

Dr. Siddhartha Sankar Bhattacharya
Department of Zoology

Omega-3 fatty acids are important nutrients that are involved in many bodily processes. The body cannot make these fatty acids and must obtain them from food sources or from supplements. Three fatty acids compose the omega-3 family: alpha-linolenic acid, eicosapentaenoic acid, and docosahexaenoic acid. Alpha-linolenic acid (ALA) is found in English walnuts, in some types of beans, and in canola, soybean, flaxseed/linseed, and olive oils. The other 2, eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA), are found in fish, including fish oil and supplements. They are polyunsaturated fatty acids with a double bond (C=C) starting after the third carbon atom from the end of the carbon chain. The fatty acids have two ends—the acid (COOH) end and the methyl (CH_3) end. The location of the first double bond is counted from the methyl end, which is also known as the omega (ω) end or the n end.

History

Although omega-3 fatty acids have been known as essential to normal growth and health since the 1930s, awareness of their health benefits has dramatically increased since the 1990s. The health benefits of the long-chain omega-3 fatty acids — primarily EPA and DHA are the best known. These benefits were discovered in the 1970s by researchers studying the Greenland Inuit Tribe. The Greenland Inuit people consumed large amounts of fat from fish, but displayed virtually no cardiovascular disease. The high level of omega-3 fatty acids consumed by the Inuit reduced triglycerides, heart rate, blood pressure, and atherosclerosis.

On September 8, 2004, the U.S. Food and Drug Administration gave "qualified health claim" status to EPA and DHA omega−3 fatty acids, stating, "supportive but not conclusive research shows that consumption of EPA and DHA [omega−3] fatty acids may reduce the risk of coronary heart disease." As of this writing, regulatory agencies

do not accept that there is sufficient evidence for any of the sugge benefits of DHA and EPA other than for cardiovascular health. further claims should be treated with caution. However the Canad Government has recognized the importance of DHA omega-3 permits the following biological role claim for DHA: "DHA. omega-3 fatty acid, supports the normal development of the br eyes and nerves."

Chemistry

Chemical structure of alpha-linolenic acid (ALA), an esse omega−3 fatty acid, (18:3Δ9c,12c,15c, which means a chain of carbons with 3 double bonds on carbons numbered 9, 12, and 1 Although chemists count from the carbonyl carbon (b numbering), physiologists count from the *n* (ω) carbon. Note th from the *n* end, the first double bond appears as the third carbo carbon bond, hence the name "*n*−3". This is explained by the fact th the *n* end is almost never changed during physiologic transformati in the human body, as it is more energy-stable, and oth carbohydrates compounds can be synthesized from the oth carbonyl end, for example in glycerides, or from double bonds in th middle of the chain.

Chemical structure of EPA and DHA.

Omega−3 fatty acids that are important in human physiology are a linolenic acid (18:3, *n*−3; ALA), eicosapentaenoic acid (20:5, *n*− EPA), and docosahexaenoic acid (22:6, *n*−3; DHA). These thr polyunsaturates have either 3, 5, or 6 double bonds in a carbon cha of 18, 20, or 22 carbon atoms, respectively. As with most naturall produced fatty acids, all double bonds are in the cis-configuration. other words, the two hydrogen atoms are on the same side of th double bond; and the double bonds are interrupted by methyle bridges ($-CH_2-$), so that there are two single bonds between each pa of adjacent double bonds.

List of omega−3 fatty acids

This table lists several different names for the most common omega−3 fatty acids found in nature.

Common name	Lipid name	Chemical name
Hexadecatrienoic acid (HTA)	16:3 (*n*−3)	*all-cis*-7,10,13-hexadecatrienoic acid
α-Linolenic acid (ALA)	18:3 (*n*−3)	*all-cis*-9,12,15-octadecatrienoic acid
Stearidonic acid (SDA)	18:4 (*n*−3)	*all-cis*-6,9,12,15-octadecatetraenoic acid
Eicosatrienoic acid (ETE)	20:3 (*n*−3)	*all-cis*-11,14,17-eicosatrienoic acid
Eicosatetraenoic acid (ETA)	20:4 (*n*−3)	*all-cis*-8,11,14,17-eicosatetraenoic acid
Eicosapentaenoic acid (EPA)	20:5 (*n*−3)	*all-cis*-5,8,11,14,17-eicosapentaenoic acid
Heneicosapentaenoic acid (HPA)	21:5 (*n*−3)	*all-cis*-6,9,12,15,18-heneicosapentaenoic acid
Docosapentaenoic acid (DPA), Clupanodonic acid	22:5 (*n*−3)	*all-cis*-7,10,13,16,19-docosapentaenoic acid
Docosahexaenoic acid (DHA)	22:6 (*n*−3)	*all-cis*-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoic acid
Tetracosapentaenoic acid	24:5 (*n*−3)	*all-cis*-9,12,15,18,21-tetracosapentaenoic acid
Tetracosahexaenoic acid (Nisinic acid)	24:6 (*n*−3)	*all-cis*-6,9,12,15,18,21-tetracosahexaenoic acid

Mechanism of action

The 'essential' fatty acids were given their name when researche found that they are essential to normal growth in young children a animals, though the modern definition of 'essential' is stricter. A sm amount of omega−3 in the diet (~1% of total calories) enabled nor growth, and increasing the amount had little to no additional effect growth. Likewise, researchers found that omega-6 fatty acids (s as γ-linolenic acid and arachidonic acid) play a similar role in nor growth. However, they also found that omega−6 was "better supporting dermal integrity, renal function, and parturition. The preliminary findings led researchers to concentrate their studies omega−6, and it is only in recent decades that omega−3 has beco of interest.

By 1979, more of what are now known as eicosanoids w discovered: thromboxanes, prostacyclins, and the leukotrienes. T eicosanoids, which have important biological functions, typic have a short active lifetime in the body, starting with synthesis fr fatty acids and ending with metabolism by enzymes. However, if rate of synthesis exceeds the rate of metabolism, the exc eicosanoids may have deleterious effects. Researchers found certain omega−3 fatty acids are also converted into eicosanoids, at a much slower rate. Eicosanoids made from omega−3 fatty ac are often referred to as anti-inflammatory, but in fact they are just l inflammatory than those made from omega−6 fats. If both omeg and omega−6 fatty acids are present, they will "compete" to transformed, so the ratio of long-chain omega−3:omega−6 fatty ac directly affects the type of eicosanoids that are produced.

This competition was recognized as important when it was found th thromboxane is a factor in the clumping of platelets, which can b cause death by thrombosis and prevent death by bleeding. Likewi the leukotrienes were found to be important immune/inflammatory-system response, and therefore relevant arthritis, lupus, asthma, and recovery from infections. The discoveries led to greater interest in finding ways to control synthesis of omega−6 eicosanoids. The simplest way would be consuming more omega−3 and fewer omega−6 fatty acids. They

during the prenatal period for the formation of synapses and membranes. These processes are also essential in postnatal development for injury response of the central nervous and retinal stimulation.

Conversion efficiency of ALA to EPA and DHA

The body converts short-chain omega−3 fatty acids to long-chain (EPA, DHA) with an efficiency below 5% in men. The omega-conversion efficiency is greater in women, possibly because of the importance for meeting the demands of the fetus and neonate for DHA. The conversion of ALA to EPA and further to DHA in humans has been reported to be limited, but varies with individuals. Women have higher ALA conversion efficiency than men, which is presumed to be due to the lower rate of use of dietary ALA for beta-oxidation. This suggests that biological engineering of ALA conversion efficiency is possible. Scientist argue that it is the absolute amount of ALA, rather than the ratio of omega−3 and omega−6 fatty acids, that controls the conversion efficiency.

The omega−6 to omega−3 ratio

Some clinical studies indicate that the ingested ratio of omega−6 to omega−3 (especially linoleic vs alpha-linolenic) fatty acids is important to maintaining cardiovascular health. However, two studies found that while omega−3 polyunsaturated fatty acids are extremely beneficial in preventing heart disease in humans, the levels of omega−6 polyunsaturated fatty acids (and therefore the ratios) were insignificant.

Both omega−6 and omega−3 fatty acids are essential; i.e., humans must consume them in the diets. Omega−6 and omega−3 eighteen-carbon polyunsaturated fatty acids compete for the same metabolic enzymes, thus the omega−6:omega−3 ratio of ingested fatty acids has significant influence on the ratio and rate of production of eicosanoids, a group of hormones intimately involved in the body's inflammatory and homeostatic processes which includes the prostaglandins, leukotrienes, and thromboxanes, among others.

Some researchers believe one cause of Americans' high rates cardiovascular disease may be an imbalance in the ratio of omeg to omega-6 fatty acids. Ideally, the ratio of omega-3 to omega-6 fa acids in the human body is 1-to-1. However, the typical American di is low in omega-3s and high in omega-6s. Many people have te twenty times more omega-6 fatty acids than omega-3 fatty acid their systems.

Health effects

Cardiovascular disease

Evidence does not support a beneficial role for omega-3 fatty a supplementation in preventing cardiovascular disease (inclu myocardial infarction and sudden cardiac death) or stroke. Eatin diet high in fish that contain long chain omega-3 fatty acids d appear to decrease the risk of stroke. Large amounts may incre low-density lipoproteins (LDL) up to 46%, although LDL cha from small to larger, buoyant, less atherogenic particles.

Omega-3 fatty acids also have mild antihypertensive effects. W subjects consumed omega-3 fatty acids from oily fish on a re basis, their systolic blood pressure was lowered by about 3.5– mmHg. The 18 carbon α-linolenic acid (ALA) has not been show have the same cardiovascular benefits that DHA or EPA may h Some evidence suggests that people with certain circul problems, such as varicose veins, may benefit from the consump of EPA and DHA, which may stimulate blood circulation, incre the breakdown of fibrin, a compound involved in clot and s formation, and, in addition, may reduce blood pressure. Evide omega−3 fatty acids reduce blood triglyceride levels, and re intake may reduce the risk of secondary and primary heart att ALA does not confer the cardiovascular health benefits of EPA DHA.

Large amounts may increase the risk of hemorrhagic stroke ; lo amounts are not related to this risk; 3 grams of total EPA/DHA d are generally recognized as safe (GRAS) with no increased ris

involved and many studies used substantially higher doses without major side effects (for example: 4.4 grams EPA/2.2 grams DHA in 2003 study). Omega-3 fatty acids in algal oil, fish oil, fish and seafood have been shown to lower the risk of heart attacks.] Omega-6 fatty acids in sunflower oil and safflower oil may also reduce the risk of cardiovascular disease.

Among omega-3 fatty acids, neither long-chain nor short-chain forms were consistently associated with breast cancer risk. High levels of docosahexaenoic acid (DHA), however, the most abundant omega-3 PUFA in erythrocyte (red blood cell) membranes, were associated with a reduced risk of breast cancer. The DHA obtained through the consumption of polyunsaturated fatty acids is positively associated with cognitive and behavioral performance. In addition DHA is vital for the grey matter structure of the human brain, as well as retinal stimulation and neurotransmission.

Psychiatric disorders

Though there is some evidence that omega-3 fatty acids are related to a variety of mental disorders. They may tentatively be useful as an add-on for the treatment of depression associated with bipolar disorder and there is preliminary evidence that EPA supplementation may be helpful in cases of depression. There however is a significant risk of bias in the literature.

Cognitive aging

Epidemiological studies suggest that consumption of omega-3 fatty acids can reduce the risk of dementia, but evidence of a treatment effect in dementia patients is inconclusive. However, clinical evidence suggests benefits of treatment specifically in patients who show signs of cognitive decline but who are not sufficiently impaired to meet criteria for dementia.

Cancer

The evidence linking the consumption of fish to the risk of cancer is

poor. Supplementation with omega-3 fatty acids does not appear to affect this risk either. A 2006 report in the Journal of the American Medical Association, in their review of literature covering cohort from many countries with a wide variety of demographics, concluded that there was no link between omega−3 fatty acids and cancer. This is similar to the findings of a review by the British Medical Journal studies up to February 2002 that failed to find clear effects of long and shorter chain omega−3 fats on total mortality, combined cardiovascular events and cancer. In those with advanced cancer and cachexia, omega-3 fatty acids supplements may be of benefit improving appetite, weight, and quality of life. Some studies in animals have found that fish oils rich in omega-3 fatty acids suppress the formation and growth of some types of cancer. Studies in humans have produced conflicting results. A recent re-analysis of 40 years of research suggests that omega-3 fatty acid supplements do not reduce cancer risk. Evidence is mixed as to whether fish oil supplements improve cancer-related weight loss.

Inflammation

Although not confirmed as an approved health claim, current research suggests that the anti-inflammatory activity of long-chain omega−3 fatty acids may translate into clinical effects. For example, there is evidence that rheumatoid arthritis sufferers taking long-chain omega−3 fatty acids from sources such as fish have reduced pain. Some potential benefits have been reported in conditions such as rheumatoid arthritis.

Adverse effects

The United States Food and Drug Administration Center for Food Safety and Applied Nutrition, Office of Nutritional Products, Labeling, and Dietary Supplements noted that known or suspected risks of EPA and DHA consumed in excess of 3 grams per day may include the possibility of:

- Increased incidence of bleeding

- Hemorrhagic stroke
- Oxidation of omega-3 fatty acids, forming biologically active oxidation products
- Increased levels of low-density lipoproteins (LDL) cholesterol or apoproteins associated with LDL cholesterol among diabetics and hyperlipidemics
- Reduced glycemic control among diabetics

Subsequent advice from the FDA and national counterparts have permitted health claims associated with heart health.

Dietary sources

Daily values

The FDA has advised that adults can safely consume a total of 3 grams per day of combined DHA and EPA, with no more than 2 g per day coming from dietary supplements i.e. from fish, eggs, meat and plant sources

Fish

The most widely available dietary source of EPA and DHA is cold water oily fish, such as salmon, herring, mackerel, anchovies, and sardines. Oils from these fish have a profile of around seven times as much omega−3 as omega−6. Other oily fish, such as tuna, also contain *n*−3 in somewhat lesser amounts. Consumers of oily fish should be aware of the potential presence of heavy metals and fat-soluble pollutants like PCBs and dioxins, which are known to accumulate up the food chain. After extensive review, researchers from Harvard's School of Public Health reported that the benefits of fish intake generally far outweigh the potential risks. Although fish is a dietary source of omega−3 fatty acids, fish do not synthesize them; they obtain them from the algae (microalgae in particular) or plankton in their diets.

Fish oil

Not all forms of fish oil may be equally digestible. Of four studies that compare bioavailability of the glyceryl ester form of fish oil vs. the ethyl ester form, two have concluded the natural glyceryl ester form is better, and the other two studies did not find a significant difference. No studies have shown the ethyl ester form to be superior, although it is cheaper to manufacture.

Eggs

Eggs produced by hens fed a diet of greens and insects contain higher levels of omega−3 fatty acids than those produced by chickens fed corn or soybeans. In addition to feeding chickens insects and greens, fish oils may be added to their diets to increase the omega-3 fatty acid concentrations in eggs. The addition of flax and canola seeds to the diets of chickens, both good sources of alpha-linolenic acid, increases the omega-3 content of the eggs, predominantly DHA.

Meat

Omega 3 fatty acids are formed in the chloroplasts of green leaves and algae. While seaweeds and algae are the source of omega 3 fatty acids present in fish, grass is the source of omega 3 fatty acids present in grass fed animals. When cattle are taken off omega 3 fatty acid rich grass and shipped to a feedlot to be fattened on omega 3 fatty acid deficient grain, they begin losing their store of this beneficial fat. Each day that an animal spends in the feedlot, the amount of omega 3 fatty acids in its meat is diminished.

Plant sources

Flaxseed (or linseed) (*Linum usitatissimum*) and its oil are perhaps the most widely available botanical source of the omega−3 fatty acid ALA. Flaxseed oil consists of approximately 55% ALA, which makes it six times richer than most fish oils in omega−3 fatty acids. A portion of this is converted by the body to EPA and DHA, though this may differ between men and women. 100 g of the leaves of Purslane

300–400 mg ALA.

Other sources

The microalgae Crypthecodinium cohnii and *Schizochytrium sp.* are rich sources of DHA, but not EPA, and can be produced commercially in bioreactors. Oil from brown algae (kelp) is a source of EPA.

In 2006 a study was published in the Journal of Dairy Science entitled "The Linear Relationship between the Proportion of Fresh Grass in the Cow Diet, Milk Fatty Acid Composition, and Butter Properties". It was found that grass fed butter contains substantially more CLA, vitamin E, beta-carotene, and omega-3 fatty acids than butter from cows raised in factory farms or that have limited access to pasture. It was also found that the softer the butter, the more fresh pasture in the cow's diet. Cows that get all their nutrients from grass have the softest butterfat of all.

Future research areas

It is now apparent that both n-6 and n-3 fatty acids are essential for normal development in mammals, and that each has specific functions in the body. N-6 fatty acids are necessary primarily for growth, reproduction, and the maintenance of skin integrity, whereas n-3 fatty acids are involved in the development and function of the retina and cerebral cortex and perhaps other organs such as the testes. Fetal life and infancy are particularly critical for the nervous tissue development. Therefore, with respect to human nutrition, adequate amounts of omega-3 fatty acids should be provided during pregnancy, lactation and infancy, but probably throughout life. We estimate that adequate levels are provided by diets containing 6-8% calories from linoleic acid and 1% from n-3 fatty acids (alpha-linolenic acid, EPA and DHA), resulting in a ratio of n-6 to n-3 fatty acids of 4:1 to 10:1.

The essentiality of n-3 fatty acids resides in their presence as DHA in neural membranes of the photoreceptors of the retina and the

synaptosomes and other subcellular membranes of the brain. The replacement of DHA in deficient animals by the n-6 fatty acid, 22:5, results in abnormal functioning of the membranes for reasons as yet to be ascertained. Most significant is the ability of fatty acid composition in the retinal and brain of deficient animals. Dietary fish oil, which contains EPA and DHA, will readily lead to a change in the composition of the membrane of retina and brain, fatty acids, with DHA replacing the n-6 fatty acid, 22:5. The interrelationship between the chemistry of neural and retinal membranes as affected by diet and their biological functioning provides an exciting prospect for future investigations.

References

1. American Heart Association. Fish and Omega-3 Fatty Acids. Accessed on June 10, 2008.
2. Delgado-Lista, J; Perez-Martinez, P; Lopez-Miranda, J; Perez-Jimenez, F (2012 Jun). "Long chain omega-3 fatty acids and cardiovascular disease: a systematic review". *The British journal of nutrition* **107 Suppl 2**: S201–13.
3. Evangelos C. Rizos, MD, PhD; Evangelia E. Ntzani, MD, PhD; Eftychia Bika, MD; Michael S. Kostapanos, MD; Moses S. Elisaf, MD, PhD, FASA, FRSH (September 2012). "Association between Omega-3 Fatty Acid Supplementation and Risk of Major Cardiovascular Disease Events: A Systematic Review and Meta-analysis". *JAMA* **308** (10): 1024–1033
4. "FDA announces qualified health claims for omega-3 fatty acids" (Press release). United States Food and Drug Administration. September 8, 2004.
5. Hegarty, B; Parker, G (2013 Jan). "Fish oil as a management component for mood disorders - an evolving signal". *Current opinion in psychiatry* **26** (1): 33–40.
6. MacLean, CH; Newberry, SJ; Mojica, WA; Khanna, P; Issa, AM; Suttorp, MJ; Lim, YW; Traina, SB; Hilton, L; Garland, R; Morton, SC (2006-01-25). "Effects of omega-3 fatty acids on cancer risk: a systematic review." *JAMA: the Journal of the American Medical Association* **295** (4): 403–15.
7. Sala-Vila, A; Calder, PC (2011 Oct-Nov). "Update on the relationship of fish intake with prostate, breast, and colorectal cancers." *Critical reviews in food science and nutrition* **51** (9): 855–71.

Some Modern Methods in Mass Spectroscopy

A bi-lingual approch

Dr. Bireswar Mukherjee
Department of chemistry

জৈব যৌগের আনবিক গুরুত্ব নির্নয় করার জন্যে ভরবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োগ বহুল পরিমানে ... অত্যাধুনিক গবেষণার কাজে এবং মূলতঃ জৈব রাসায়নিক যৌগের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ ... ভরবীক্ষণের মুলতত্ত্ব এবং তার যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে এখানে ব্যাখ্যা করা হবে না।

এই প্রবন্ধে মূলত 252 ক্যালিফর্নিয়াম প্লাজমা ডিসরপ্সান ভরবীক্ষণের মূল তত্ত্বটি, CI ... নিয়ে আলোচনা করা হলো।

252 - ক্যালিফর্নিয়াম মৌলটি তেজষ্ক্রিয় পদার্থ। এটি প্রতি-নিয়ত ভেঙে যায়। তেজষ্ক্রিয়তা ...ক্রিয়ার ঘটনা। ^{252}cf অনেক ভাবে ভাঙলেও প্রধানত $^{142}Ba^{18+}$ এবং $^{106}TC^{22+}$ মৌলগুলি ... করে। ক্যাটায়নগুলির গতিশক্তি অত্যাধিক বেশি, যথাক্রমে 79 এবং 104 Mev.

Figure-1

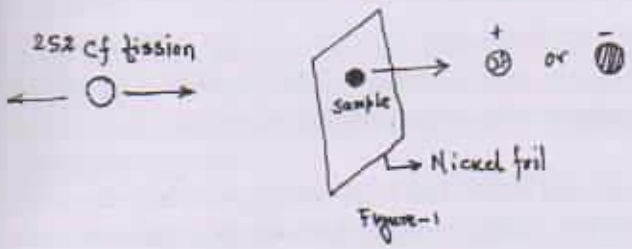

মূলতত্ত্বটি বুঝতে গেলে Fig-1 পর্যবেক্ষণ করা জরুরী ভরবেগ সংরক্ষণ সুত্র মেনে চলে ...লে দুই মৌল দুইটি বিপরীত দিকে অত্যন্ত দ্রুত চলতে থাকে। এবারে একটি নিকেল পাতে (10^{-3}mm) একটি ছোট গর্ত করা হলো, এই গর্তে খুব সামান্য পরিমান পরীক্ষাধীন পদার্থ নেওয়া হলো, অতিদ্রুতগামী কোন ভাঙনজাত ক্যাটায়ন এই জায়গায় আঘাত করলে, এই জায়গাটির তাপমাত্রা অতি কম সময়ের মধ্যে প্রায় 10,000 Kএ পৌছায়। অর্থাৎ জায়গাটি একটি ক্ষনস্থায়ী প্লাজমা অঞ্চলে পরিণত হয়, এই অত্যধিক তাপমাত্রায় পরীক্ষাধীন যৌগটির অনু সরাসরি বাস্পীভূত হয়ে ক্যাটায়ন বা অ্যানায়ন উৎপন্ন করে। এই আয়নিত পরীক্ষাধীন অনুটি পর্যায়ক্রমে প্রথমে তড়িৎ ক্ষেত্র ও তারপর চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে পাঠানো হয়। পরিশেষে আনবিক আয়নটি ডিটেক্টর বা নির্নায়ক যন্ত্রে-পাঠানো হয়। তার ফলে আমরা যৌগটির ভরবর্ণালীর লেখচিত্রটি পাই। এর থেকে আমরা যৌগটির আনবিক গুরুত্ব জানতে পারি।

^{252}Cf ভরবীক্ষণে সাধারণতঃ অত্যধিক ভারি আনবিক গুরুত্ব সম্পন্ন যৌগ
পলিস্যাকারাইড বা প্রোটিনের ভর জানা যায়। ^{252}Cf ভরবীক্ষণের সবথেকে বড় সুবিধা হলো,
যৌগের আয়নটি ভরবীক্ষণ যন্ত্রের নলের (Tube) মধ্যে খুব বেশী ভেঙ্গে যায় না, ফলে নিশ্চিত
তার ভর সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

(Chemical Ionization Technique)
রাসায়নিক আয়নীভবন পদ্ধতি :-

এই পদ্ধতিতে প্রথমে কোন বাহক গ্যাস (Carrier gas) ব্যবহার করে তাকে আয়নিত
হয়। বিভিন্ন বাহক গ্যাস ব্যবহার করা যায়। যেমন - মিথেন,অ্যামোনিয়া ইত্যাদি। বহুল প্রচলিত
গ্যাস মিথেন। মিথেনকে ইলেকট্রন দিয়ে আঘাত করলে নীচের পথ দিয়ে এটা CH_5^+ রেডি
ক্যাটায়নে পরিবর্তিত হয়ঃ-

$$CH_4 + e \rightarrow CH_4^{+\cdot}$$
$$CH_4^{+\cdot} \rightarrow CH_3^+ + H\cdot$$
$$CH_4^{+} + CH_4 \rightarrow CH_5^+ + CH_3^{\cdot}$$
$$CH_5^+ + R{-}H \rightarrow RH_2^+ + CH_4$$
$$CH_3^+ + CH_4 \rightarrow C_2H_5^+ + H_2$$

$^+CH_5$ আয়নটি পরীক্ষাধীন পদার্থ যেমন R-H কে একটি প্রোটিন দান করে এবং R
ক্যাটায়নটি উৎপন্ন করে। RH_2^+ ক্যাটায়নকে বিশ্লেষক প্রকোষ্ঠে চালনা করে এর ভর নির্ণয় করা
এর থেকে পরীক্ষাধীন পদার্থ (R - H) এর আনবিক গুরুত্ব জানা যায়।

এরপরে শেষ পদ্ধতিটি হলো FAB technique বা Fast atom bombardm
পোলার বৃহৎ অনু যেমন, পেপটাইড এর আনবিক ওজন এই পদ্ধতিতে সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়।

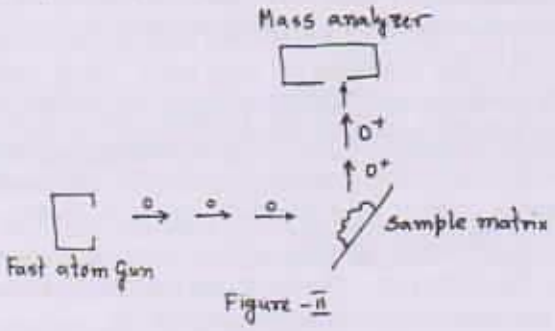

Figure - II

FAB এর মূলনীতি হলো অতিক্রত মৌল উৎপাদন করে তাকে পরীক্ষাধীন পদার্থকে আঘাত করানো।

…enon (xe) পরমানুটি ব্যবহার করা হয়। অতিক্রত পরমানুটি পরোক্ষ পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হয়।

$$Xe + e \rightarrow Xe^{+\cdot} + 2e$$

$$Xe^{+\cdot} \xrightarrow{\text{ত্বরন}} \underline{Xe}^{+\cdot}$$

$$\underline{Xe}^{+\cdot} + Xe \rightarrow Xe^{+\cdot} + \underline{Xe}$$

…থমে xe অ্যাটমকে ইলেকট্রন দ্বারা আঘাত করলে $xe^{+\cdot}$ আয়নটি পাওয়া … পর $xe^{+\cdot}$ আয়নটি একটি উচ্চ তড়িৎ বিভবের মধ্যে পাঠানো হয়। এই অবস্থায় … এর গতিশক্তি অত্যধিক বেশী হয়। এই দ্রুতগামী $xe^{+\cdot}$ কে $\underline{xe}^{+}$ এইভাবে প্রকাশ …।

এই দ্রুতগামী $\underline{xe}^{+\cdot}$ কে একটি xe গ্যাস প্রকোষ্ঠে (Chamber) চালনা করলে, … এর সঙ্গে xe এর সংঘর্ষ হয় ফলে গতিশক্তির বিনিময় ঘটে। প্রশমিত xe মৌলটি …শক্তির জেনেন (<u>xe</u>) মৌলে পরিবর্তিত হয়। এবারে পরীক্ষাধীন যৌগটিকে গ্লিসারল …/Nacl এ মিশ্রিত করে একটি ম্যাট্রিক্স তৈরী করা হয়। উচ্চশক্তির জেনন (<u>xe</u>) … এই ম্যাট্রিক্সের মধ্যে চালনা করা হয়। <u>xe</u> এর সাথে যৌগটির সংঘর্ষে সরাসরি …টি আয়নে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে সাধারণত আয়নটি $[M + Na]^{+}$ বা $[M+K]^{+}$ হিসাবে …চিত্রে ধরা পরে। এই পদ্ধতিতে আনবিক আয়নটি খুব কম ভেঙ্গে যায়। প্রকৃত …নবিক ভর খুব সহজেই জানা যায়।

ভরবর্ণালীর আরও আধুনিক পদ্ধতি, যেমন - Quadrupole Mass …ectroscopy, Time of flight (TOF) Mass Spetroscopy আবিষ্কৃত হয়েছে।

…ferences :

… Mc Lafferty, F.W.– Interpretation of Mass Spectra, 3rd ed. 1980.

… W. Kemp, Organic Spectroscopy.

Discovery of Higgs boson in LHC

Dr Lina Paria
Department of Physics

All the hitherto known physical phenomena and structures in the Universe from the minuscule quarks making up hadrons to gi stellar conglomerations called galaxies are due to four interactions, *viz.* gravitational, electromagnetic, strong and Gravitation makes the apple fall on ground and keeps our bound to the Sun as well. The television serials from Mond Sunday are brought to us by the electromagnetic interaction, gives shape and form to solid, liquid and gaseous matter, all ma of molecules and atoms. The strong interaction mould nu structures, the building block of atoms themselves. Weak inter mediates the transformations of fundamental particles called q and leptons. In the present day universe on a scale in which strength of the gravitational interaction, the most feeble one a the quartet, is unity, the strength of the weak and electromag interactions are 10^{25} and 10^{36}, respectively, while the strong inter has a strength of 10^{38}, whence the name. The ranges over which th interactions are opetative are rather diverse. The strong and w interactions come into play between particles which are about metres and 10^{-18} metres apart, respectively, while the other two af particles however far apart they are.

quarks	up (u)	down (d)	charm (c)	strange (s)	top (t)	botton
leptons	electron (e^-)	electron neutrino (ν_e)	muon (μ^-)	muon neutrino (ν_μ)	tau (τ^-)	tau ne (ν_τ)
	positron (e^+)	($\overline{\nu}_e$)	(μ^-)	($\overline{\nu}_\mu$)	(τ^-)	($\overline{\nu}_\tau$)
bosons	photon (γ)	W	Z	gluon (g)	Higgs (H^0)	graviton

Table 1: Particle content of the Standard Model

As shown in *Table 1*, the totality of known matter in the universe made up of certain fundamental particles classified as six quarks a six leptons within the most successful theory of mankind till date, t *standard model*. Within this schemata the interactions are attribut to exchange of corpuscular entities, photon and gluon for t

electromagnetic and strong interactions, respectively, and three more mediating the weak interaction. Despite its nonpareil success incorporation of gravitational interaction in the standard model has not met with success so far.

All the particles considered in the standard model are a priori identical in a certain sense, symmetric under the so-called electroweak symmetry group, consequently restricted to have the same mass. But the masses of various particles need to differ if they are to describe natural phenomena. A certain particle, named after Peter Higgs who predicted its existence[1], breaks this symmetry thereby allowing these particles to acquire the masses necessitated by nature. As a rather crude analogy of symmetry breaking consider a long stick standing on its end on your dining table. Unstable as it is, it remains in position due to a symmetry: all the directions in which it may fall are identical. The stick per se can not afford a preferential fall. However, a little push of your finger breaks this symmetry, choosing a direction for the stick to fall and it does fall in that very direction. This is what the Higgs particle does to the otherwise identical fundamental particles. It renders other particles massive with different characteristic masses. Symmetry breaking mechanism, however, has also been discussed independently in different contexts by Brout, Englert, Guralnik, Hagen and Kibble[2].

After the introduction of the standard model in its current form in the early seventies of the last century colliders have been built at various places and the fundamental particles have been detected strengthening the experimental basis of the model. The Higgs particle, characterized by having no electric and color charges has been elusive so far. It also have zero spin and is thus a boson. The Large Hadron Collider (LHC) was built at the Organisation Européenne Pour la Recherche Nucléaire (CERN) between 1998 and 2008 to search for the Higgs particle. At the LHC beams of protons and anti-protons are made to collide after raising their energies to an enormity of a few trillion electron Volts. This is about the same energy carried by a flying mosquito, although packed now in a volume miilion million times smaller. The immensity of the collision

shatters the colliding particles and a shower of particles, as from fireworks though much more colossal, ensues. A Higgs particle a rare, however, probability of its production being one in ten billion collisions in the LHC. The standard model fixes the mass of the Higgs boson only within a range of allowed values. Variants and extensions of the standard model require different ranges of the mass of the Higgs particle. The most commonly expected sources of its production, with varying probability are the following[3,4,5].

- *Gluon Fusion* : In a collision of a proton (p) and an antiproton $(\bar{p})$ the gluons binding the quarks together in $p(uud)$ & antiquarks in $\bar{p}$ $(\bar{u}\ \bar{u}\ \bar{d})$ may fuse together to form a loop of virtual quarks (chiefly the heavy quaks, *i.e.* bottom and top) yielding a Higgs boson in turn. This is the most dominant contribution to the production of Higgs boson in the LHC.
- *Higgs Strahlung* : Collision between an elementary fermion (e.g. a quark or an electron) and its anti-particle (*i.e.* an antiquark or a positron) can produce a virtual W or Z boson which can emit a Higgs boson provided the W or the Z boson carries sufficient energy.
- *Weak boson fusion* : Two colliding fermions may exchange a virtual W or Z boson which can emit a Higgs particle. This also is an important process of Higgs production in LHC, second only to the gluon fusion in terms of probability.
- *Top fusion* : In this least likely, nonetheless possible, case, each gluon in a colliding pair decay into a heavy quark-anti-quark duo. A quark and an anti-quark from each pair can then combine to form a Higgs particle.

Adding to the difficulty of detection, a Higgs boson is rather short lived, with a lifetime of about 10^{-22} seconds, after which it decays producing other particles. Finding such an evanescent entity from the debris of collision is a difficult task. Indeed, the existence of a Higgs particle is only known from the nature of the decay products. The decay of a Higgs paricle can happen in more than one ways too. It can decay into two photons, or to two Z bosons or two W bosons, with the latter decaying subsequently into four leptons, or into a pair of bottom-antibottom quarks, to mention a few. Even the decay modes, or *channels*, come with unequal probabilities. The first one, for

ample, is very rare. We are, however, not spared from looking for this channel as the energy and momentum of photons can be measured very precisely leading to an extremely accurate determination of the masses of its decay products. Indeed, this channel is very effective and relevant for the detection of the Higgs particle.

Two detectors, called A Toroidal LHC Apparatus (ATLAS) and Compact Muon Solenoid (CMS), were commissioned to analyze the particles produced in the collisions. On the 4th of July, 2012, the toil of hundreds of scientists for about a decade and a half culminated in the first glimpse of the Higgs boson with mass in the range 125 GeV/c^2 to 127 GeV/c^2. Scientists across the globe are waiting agog for a final confirmation of the discovery which will take the humankind a step forward in discerning the mysteries of nature has in lore for us.

References

1. P. Higgs, Phys. Lett. 12 (1964) 132;
2. F. Englert and R. Brout, Phys. Rev. Lett. 13 (1964) 321; G. Guralnik, C. Hagen and T. Kibble, Phys. Rev. Lett. 13 (1964) 585; P. Higgs. Phys. Rev. 145 (1966) 1156.
3. Baglio *et. al.* arXiv 1003.4266
4. Baglio *et. al.* ArXiv 1012.0530
5. arXiv 1201.3084

ALLELOPATHY : CHEMICAL WARFARE IN PLANTS - AN OVERVIEW

Dr. Supatra Sen
Department of B.Ed.

Abstract

The International Allelopathy Society defined **Allelopathy** as *"Any process involving secondary metabolites produced by plants, micro-organisms, viruses and fungi that influence the growth and development of agricultural and biological systems (excluding animals), including positive and negative effects."* The phenomenon of **Allelopathy**, where a plant species chemically interferes with the germination, growth or development of another plant species has been known for over 2000 years. The term Allelopathy was introduced by Molisch in 1937, and is derived from the Greek words *allelon* '**of each other**' and *pathos* '**suffer**' and mean the inhibitory and stimulatory effect of one upon the other.

Commonly cited effects of allelopathy include reduced seed germination and seedling growth. Chemicals released from plants and imposing allelopathic influences are termed **allelochemicals** or **allelochemics**. Most allelochemicals are classified as secondary metabolites and are produced as offshoots of the primary metabolic pathways of the plant. Known sites of action for some allelochemicals include cell division, pollen germination, nutrient uptake, photosynthesis and specific enzyme function. Allelopathic inhibition is complex and can involve the interaction of different classes of chemicals like phenolic compounds, flavonoids, terpenoids, alkaloids, steroids, carbohydrates and amino acids, with mixtures of different compounds sometimes having a greater allelopathic effect than individual compounds alone.

Allelopathy, a form of **chemical competition** may act directly on plants and other organisms and indirectly through alteration of soil properties, nutrient status and altered populations and/or activity of harmful or beneficial organisms like micro-organisms, insects, nematodes etc. Allelopathic plants may have wide-ranging effects in ecosystems. In agricultural systems allelopathy can be part of the interference between crops and between crops and weeds and therefore affect crop production. Allelopathy holds great prospects for finding alternative strategies for weed management, thereby reducing the reliance on traditional herbicides. Due to their origin from natural sources, the allelopathic compounds will be biodegradable and less polluting than traditional herbicides as per certain authors. Biotechnological transfer of allelopathic traits between species could widen the path to **Sustainable Agriculture.**

Introduction

The International Allelopathy Society defined **Allelopathy** as *"Any*

of the primary metabolic pathways of the plant. Often, the functioning in the plant is unknown, but some allelochemicals are known also to have structural functions (e.g. as intermediates of lignification) or to play a role in the general defence against herbivores and plant pathogens.[4,5,6] Allelochemicals can be present in several parts of plants including roots, rhizomes, leaves, stems, pollen, seeds and flowers. Allelochemicals are released into the environment by root exudation, leaching from above-ground parts and volatilisation and/or by decomposition of plant material.[2] When susceptible plants are exposed to allelochemicals, germination, growth and development may be affected. The most frequently reported gross morphological effects on plants are inhibited or retarded seed germination, effects on coleoptile elongation and on radicle, shoot and root development. Known sites of action for some allelochemicals include cell division, pollen germination, nutrient uptake, photosynthesis, and specific enzyme function.

Allelopathic chemicals can be present in any part of the plant. They can be found in leaves, flowers, roots, fruits, or stems. They can also be found in the surrounding soil. Target species are affected by these toxins in many different ways. The toxic chemicals may inhibit shoot/root growth, inhibit nutrient uptake, or may attack a naturally occurring symbiotic relationship thereby destroying the plant's usable source of a nutrient.

Allelopathic inhibition is complex and can involve the interaction of different classes of chemicals like phenolic compounds, flavonoids, terpenoids, alkaloids, steroids, carbohydrates, and amino acids, with mixtures of different compounds sometimes having a greater allelopathic effect than individual compounds alone. Furthermore, physiological and environmental stresses, pests and diseases, solar radiation, herbicides, and less than optimal nutrient, moisture, and temperature levels can also affect allelopathic weed suppression. Different plant parts, including flowers, leaves, leaf litter and leaf mulch, stems, bark, roots, soil and soil leachates and their derived compounds, can have allelopathic activity that varies over a growing season. Allelopathic chemicals can also persist in soil, affecting both neighboring plants as well as those planted in succession. Although

erived from plants, allelochemicals may be more biodegradable than traditional herbicides but may also have undesirable effects on non-target species, necessitating ecological studies before widespread use.

The effects of allelochemicals action are detected at molecular, structural, biochemical, physiological and ecological levels of plant organization.[7] Allelopathic compounds may induce a secondary oxidative stress manifested as enlarged production of reactive oxygen species (ROS).[8] ROS are known to act as signaling molecules, regulating plant response to biotic (pathogen attack) and abiotic (drought, salinity, or heavy metals) stresses.[9] In addition to, ROS are emerging as important regulators of plant development.[10] Plant growth and development as well as plant response to stresses is controlled also by phytohormones. Hormonal signaling transduction depends on ROS production since; ROS have been implicated as second messengers in plant hormone responses.[11] Ethylene and abscisic acid (ABA) are both regarded as typical stress hormones; they are also involved in regulation of seed dormancy and germination.[12]

Environmental Impact

Allelopathy is a form of **chemical competition**. Competition, by definition, takes one of two forms--exploitation or interference. The allelopathic plant is competing through "**interference**" chemicals. Competition is used by both plants and animals to assure a place in nature. Plants will compete for sunlight, water and nutrients and like animals for territory. Competition, like parasitism, disease and predation, influences distribution and number of organisms in an ecosystem. The interactions of ecosystems define an environment. When organisms compete with one another, they create the potential for resource limitations and possible extinctions. Allelopathic plants prevent other plants from using the available resources and thus influence the evolution and distribution of other species. One might say that **allelopathic plants control the environments in which they live**.

Biotic and abiotic factors can influence both the production of allelochemicals by the donor species (the species from which the allelochemicals originate) and modify the effect of an allelochemical on the receiver plant. The influence of factors such as light, nutrient availability, water availability, pesticide treatment and disease can affect the amount of allelochemicals in a plant.[13,14] Even though the production of allelochemicals in a plant can increase in response to stress, it is not clear whether a corresponding release of allelochemicals to the environment also occur.[13,15] In general, the sensitivity of target plants to allelochemicals is affected by stress and typically it is increased.[14,15]

Chemical Warfare in the Plant Kingdom

Black Walnut

One of the most famous allelopathic plants is Black Walnut (*Juglans nigra*). The chemical responsible for the toxicity in Black Walnut is **Juglone** (5 hydroxy-1,4 napthoquinone) and is a *respiration inhibitor*. Solanaceous plants, such as tomato, pepper, and eggplant are especially susceptible to Juglone. These plants, when exposed to the allelotoxin, exhibit symptoms such as wilting, chlorosis (foliar yellowing) and eventually death. Other plants may also exhibit varying degrees of susceptibility and some have no noticeable effect at all. Some plants that have been observed to be tolerant of Juglone include lima bean, beets, carrot, corn, cherry, black raspberry, catalpa, Virginia creeper, violets and many others.

Juglone is present in all parts of the Black Walnut, but especially concentrated in the buds, nut hulls and roots. It is not very soluble in water and thus, does not move very rapidly in the soil. Toxicity has been observed in all soil with Black Walnut roots growing in it (roots can grow 3 times the spread of the canopy), but is especially concentrated closest to the tree, under the drip line. This is mainly due to greater root density and the accumulation of decaying leaves and hulls.

Tree-Of-Heaven

The Tree-Of-Heaven, or Ailanthus (*Ailanthus altissima*) is a recent addition to the list of allelopathic trees. **Ailanthone**, an allelotoxin extracted from the root bark of *Ailanthus*, is known for its "potent post-emergence herbicidal activity". *Ailanthus* poses a serious weed problem in urban areas.

Sorghum

The major constituent of sorghum that causes allelopathic activity is **sorgolene** (2-hydroxy-5-methoxy-3-{(8'z,11'z)-8',11',14'-pentadecatriene}-p-benzoiquinone). Sorgolene is found in the root exudates of most sorghum species and has been shown to be a very potent allelotoxin that disrupts mitochondrial functions and inhibits photosynthesis. It is being researched extensively as a weed suppressant.

Leucaena leucocephala

The miracle tree promoted for re-vegetation, soil and water conservation and animal improvements in India, also contains a toxic, non-protein amino acid in leaves and foliage that inhibits the growth of other trees but not its own seedlings. *Leucaena* species have also been shown to reduce the yield of wheat but increase the yield of rice.

Others

There are many other known allelopathic species, and many that are highly suspected of being allelopathic including various wetland species, grasses, and other woody plants such as Fragrant Sumac (*Rhus aromaticus*). Tobacco (*Nicotiana rustica*), Rice (*Oryza sativa*), Pea (*Pisum sativum*), etc. are known to have root allelotoxins. Numerous crops have been investigated more or less thoroughly for allelopathic activity towards weeds or other crops. A suppressive effect on weed, possibly mediated by the release of allelochemicals

has been reported for a wide range of temperate and tropic
These include alfalfa (*Medicago sativa*), barley (*Hordeum vul*
clovers (*Trifolium* spp., *Melilotus* spp.) oats (*Avena sativa*)
millet (*Pennisetum glaucum*), rice (*Oryza sativa*) rye (*S*
cereale), sorghums (*Sorghum spp.*), sunflower (*Helianthus an*
sweet potato (*Ipomoea batatas*) and wheat (*Triticum aestivum*
Leachates of the chaste tree or box elder can retard the grow
pangolagrass but stimulate growth of bluestem, another p
grass.

Table : **Examples of allelopathy from published research**

Allelopathic Plant	Impact
Rows of black walnut interplanted with corn in an alley cropping system	Reduced corn yield attributed production of **juglone**, an allelop compound from black walnut, found meters from trees
Rows of *Leucaena* interplanted with crops in an alley cropping system	Reduced the yield of wheat and turm but increased the yield of maize and rice
Lantana, a perennial woody weed pest in Florida citrus	*Lantana* roots and shoots incorpora into soil reduced germination and gro of milkweed vine, another weed
Sour orange, a widely used citrus rootstock in the past, now avoided because of susceptibility to citrus tristeza virus	Leaf extracts and volatile compound inhibited seed germination and ro growth of pigweed, bermudagrass, a lambsquarters
Red maple, swamp chestnut oak, sweet bay, and red cedar	Preliminary reports indicate that woo extracts inhibit lettuce seed as much as o more than black walnut extracts

Eucalyptus and neem	A spatial allelopathic relationship if wheat was grown within 5 m
Black tree or box elder	Leachates retarded the growth of pangola grass, a pasture grass but stimulated the growth of bluestem, another grass species
Mango	Dried mango leaf powder completely inhibited sprouting of purple nutsedge tubers.
Tree of Heaven	**Ailanthone**, isolated from the Tree of Heaven, has been reported to possess non-selective post-emergence herbicidal activity similar to paraquat
Rye and wheat	Allelopathic suppression of weeds when used as cover crops or when crop residues are retained as mulch.
Broccoli	Broccoli residue interferes with growth of other cruciferous crops that follow

Prospects for the application of allelopathy to farming

Allelopathic interactions between plants have been studied in both managed and natural ecosystems. In agricultural systems allelopathy can be part of the interference between crops and between crops and weeds and may therefore affect the economic outcome of the plant production. Both crop and weed species with allelopathic activity are known.[21-23]

Recently, several papers have suggested that **allelopathy holds great prospects for finding alternative strategies for weed management**. Thereby, the **reliance on traditional herbicides in crop production can be reduced**. [24-31] The allelopathic activity of some crops, for example rye, is to some extent used in weed

management.[20,29] This widens the opportunity for improving the allelopathic activity of crops through traditional breeding strategies or by genetic engineering.

Use of allelopathic crops

Allelopathic crops can be used to control weeds by -
1) Use of crop cultivars with allelopathic properties
2) Application of residues and straw of allelopathic crops as mulches
3) Use of an allelopathic crop in a rotational sequence where the allelopathic crop can function as a smother crop or where residues are left to interfere with the weed population of the next crop

Research Strategies and Potential Applications

Biotechnological transfer of allelopathic traits between species has been suggested as a possibility and this could for example be from wild or cultivated plants into commercial crop cultivars.[26,32] So far a genetically modified plant with enhanced allelopathic activity has not been marketed. Another research area within allelopathy is the search and development of new herbicides through the isolation, identification and synthesis of active compounds from allelopathic plants.[27,28,33] These compounds are often referred to as '**natural herbicides**.' Phenolic allelochemicals have been observed in both natural and managed ecosystems, where they cause a number of ecological and economic problems, such as declines in crop yield due to soil sickness, regeneration failure of natural forests, and replanting problems in orchards. Phenolic allelochemical structures and modes of action are diverse and may offer potential lead compounds for the development of future herbicides or pesticides.[34]

Weed control mediated by allelopathy - either as natural herbicides or through the release of allelopathic compounds from a living crop cultivar or from plant residues - is often assumed to be advantageous for the environment compared to traditional herbicides. Due to their origin from natural sources, some authors suggest that the allelopathic compounds will be biodegradable and less polluting than traditional herbicides.[18,28]

According to recent reports, the green macro alga, *Ulva lactuca*, inhibits the growth of seven common harmful algal bloom species *via* allelopathy.[35] Freshwater cyanobacteria produce several bioactive secondary metabolites with diverse chemical structure, which may achieve high concentrations in the aquatic medium when cyanobacterial blooms occur. Some of the compounds released by cyanobacteria have allelopathic properties, influencing the physiological processes of other phytoplankton or aquatic plants.[36]

Allelopathy and Sustainable Agriculture

Many scientists had reported the significance of toxic effects of plant residues decomposing in soil, leading to the reduction in crop productivity. The productivity of many crops (*Sorghum bicolor*, *Medicago sativa*, *Oryza sativa*, *Asparagus officinalis*, *Phaseolus radiatus*, *Saccharum sinensis*, etc.) was reduced significantly after a continuous monoculture. The crop productivity declines due to (i) crops produce phytotoxic substances in soil and (ii) the accumulation of phytotoxins causes the imbalance of microbial population, such as *Fusarium oxysporum* in soil. These harmful allelopathic effects could be reduced through crop rotation or improving soil drainage in field. In a unique example of pasture and forest intercropping system was demonstrated that an aggressive kikuyu grass (*Pennisetum clandestinum*), was introduced into the deforested conifer land. The kikuyu grass suppressed the growth of weeds significantly, but was not harmful to the regeneration growth of conifer plants or seeding growth of other hardwood trees. The pasture-forest intercropping system, indeed, benefited the forest management by reducing the use of herbicide, saving expensive manpower, and enhancing forage material for livestock. Finally, in recent years a unique system of using the plant parts, leaves, twigs, or roots, of allelopathic plants to make a cocktail of agrochemicals to replace conventional herbicides, fungicides, or insecticides, resulting in avoiding the residual effects of agrochemicals and reducing the environmental deterioration has been developed. Using advanced biotechnology, the allelopathic genes can be introduced into crops which possess the allelopathic

potential to suppress its competitive weeds in the field. Th[illegible] **allelopathy plays an important role in sustainable agricultur[illegible]**

Conclusion

Crop allelopathy has seldom been used effectively by farme[illegible] **weed management**. Traditional breeding methods have not [illegible] successful in producing highly allelopathic crops with good yi[illegible] Genetic engineering may have the potential for overcoming [illegible] impasse. The research focuses on molecular aspects of plant - p[illegible] and plant – microorganism chemical interactions (allelopathy). T[illegible] use of model systems allows insights in plant reactions to def[illegible] allelochemicals and in strategies of different organisms to cope w[illegible] the compounds. One aim is to elucidate the molecular backgr[illegible] responsible for plant growth inhibition or stimulation, for sensiti[illegible] or tolerance against allelochemicals. Major aims are [illegible] characterization of involved proteins, their molecular adaptio[illegible] detoxification processes during evolution using transgenic plants [illegible] the gene expression modulated by allelochemicals. Allelochemi[illegible] of interest are benzoxazolinone (BOA), terpenoids and alkaloids. [illegible] combining plant biochemistry with molecular allelopathy we [illegible] expect major headways towards **sustainable agriculture**.

REFERENCES

1. Torres, A., Oliva, R. M., Castellano, D. & Cross, P., First World Congr[illegible] on Allelopathy, A Science of the Future., SAI (University of Cadiz), Sp[illegible] Cadiz, (1996) pp. 278.
2. Rice, E. L., Allelopathy, Second Edition, Academic Press, Inc., Orl[illegible] (1984).
3. Rizvi, S. J. H., Haque, H., Singh, V. K. & Rizvi, V., A discipline ca[illegible] allelopathy, In Allelopathy. Basic and applied aspects (ed. S. J. H.Ri[illegible] and V. Rizvi), Chapman & Hall, London, (1992) pp. 1-8.
4. Einhellig, F. A., Allelopathy - Current Status and Future Goals, [illegible] Allelopathy: Organisms, Processes and Applications. (ed. Inderjit, K. M. M. Dakshini and F. A. Einhellig), American Chemical Society, (1995) p[illegible] 1-24.

5. Corcuera, L. J., Biochemical basis for the resistance of barley to aphids, Review article number 78, Phytochemistry 33 (1993) 741.

6. Niemeyer, H. M., Hydroxamic acids (4-hydroxy-1,4-benzoxazin-3-ones), defence chemicals in the Gramineae, Phytochemistry 27 (1988) 3349.

7. Gniazdowska, A. & Bogatek, R., Allelopathic interaction between plants: Multi site action of allelochemicals, *Acta Physiol Plant.* 27 (2005) 395.

8. Weir, T., Park S.W. & Vivianco J. M., Biochemical and physiological mechanisms mediated by allelochemicals, *Curr Opin Plant Biol.* 7 (2004) 472

9. Foyer C.H. & Noctor. G., Redox homeostasis and antioxidant signaling: A metabolic interface between stress perception and physiological responses, *Plant Cell,* 17 (2005) 1866.

10. Gapper, C. & Dolan, L., Control of plant development by reactive oxygen species, *Plant Physiol.* 141 (2006) 341.

11. Kwak, J.M., Nguyen, V. & Schroeder, J.I., The role of reactive oxygen species in hormonal responses, *Plant Physiol.* 141 (2006) 323.

12. Kucera, B., Cohn, M.A. & Leubner-Metzger, G., Plant hormone interactions during seed dormancy release and germination, *Seed Sci Res.* 15 (2005) 281.

13. Inderjit & Del Moral, R., Is separating resource competition from allelopathy realistic ? Botanical Review 63 (1997) 221.

14. Reigosa, M. J., Sánchez-Moreiras, A. & Gonzales, L.,Ecophysiological approach in allelopathy. Critical Reviews in Plant Sciences 5 (1999) 577.

15. Einhellig, F. A., Interactions involving allelopathy in cropping systems, Agronomy Journal 88 (1996) 886.

16. Dilday, R. H., Lin, J. & Yan, W., Identification of Allelopathy in the Usda-Ars Rice Germplasm Collection, Australian Journal of Experimental Agriculture 34 (1994) 907.

17. Narwal, S. S., Potentials and prospects of allelopathy mediated weed control for sustainable agriculture, In Allelopathy in Pest Management for Sustainable Agriculture, Procceding of the International Conference on Allelopathy, vol. II (ed. S. S. Narwal and P. Tauro), Scientific Publishers, Jodhpur, (1996) pp. 23.

18. Narwal, S. S., Sarmah, M. K. & Tamak, J. C., Allelopathic strategies for weed management in the rice-wheat rotation in northwestern India, In Allelopathy in Rice, Proceedings of the Workshop on Allelopathy in Rice, 25-27 Nov. 1996, Manila (Philippines): International Rice Research

Institute (ed. M. Olofsdotter), IRRI Press,Manila, (1998).

19. Miller, D. A., Allelopathy in forage crop systems, Agronomy Journal 88 (1996) 854.

20. Weston, L. A., Utilization of Allelopathy For Weed Management in Agroecosystems, Agronomy Journal 88 (1996) 860.

21. Inderjit & Dakshini, K. M. M., Allelopathic interference of chickweed, Stellaria media with seedling growth of wheat (Triticum aestivum), Canadian Journal of Botany 76 (1998) 1317.

22. Inderjit & Foy, C. L., Nature of interference mechanism of mugwort (Artemisia vulgaris), Weed Technology 13 (1999) 176.

23. Putnam, A. R. & Weston, L. A., Adverse impacts of allelopathy in agricultural systems, In The Science of Allelopathy (ed. A. R. Putnam and C. S. Tang), Wiley, New, York, (1986) pp. 43.

24. An, M., Pratley, J. & Haig, T., Allelopathy: From concept to reality, In Proceeding 9th Australian Agronomy Conference., Wagga, Australia (1998) pp. 563.

25. Inderjit & Keating, K. I., Allelopathy: Principles, Procedures, Procecesses, and Promises for Biological Control, In: Advances in Agronomy, (Eds.) Sparks D.L. Academic Press, 67 (1999) 141.

26. Macias, F. A., Allelopathy in the search for natural herbicides models, In Allelopathy: Organisms, Processes and Applications (ed. K. M.M. Inderjit and E. F.A.), American Chemical Society (1995) pp. 310.

27. Macias, F. A., Molinillo, J. M. G., Torres, A., Varela, R. M. & Castellano,D., Bioactive flavonoids from Helianthus annuus cultivars, Phytochemistry, 45 (1997) 683.

28. Macias, F. A., Oliva, R. M., Simonet, A. M. & Galindo, J. C. G., What are allelochemicals? In Allelopathy in rice, Proceedings of the Workshop on Allelopathy in Rice, 25-27 Nov 1996, (ed. M. Olofsdotter), IRRI Press, Manilla (1998) pp. 69.

29. Olofsdotter, M., Allelopathy for weed control in organic farming, Sustainable Agriculture for Food, Energy and Industry, (1998) 453.

30. Olofsdotter, M., Allelopati - en fremtidig komponent i iukrudtsbekæmpelse, Allelopathy - a future component of weed management, 16. Danske Planteværnskonference 1999. Ukrudt. DJF Rapport nr, 9 (1999) 101.

31. Wu, H., Pratley, J., Lemerle, D. & Haig, T., Crop cultivars with allelopathic capability. Weed Research, 39 (1999) 171.

32. Chou, C.-H., Roles of allelopathy in plant biodiversity and sustainable agriculture. Critical Reviews in Plant Sciences, 18 (1999) 609.

33. Duke, S. O., Potent phytotoxins from plants, In VII International Congress of Ecology 19-25 July 1998. (ed. A. Farina, J. Kennedy and V.Bossù), Firenze, Italy (1998) pp. 120.

34. Li, Zhao-Hui, Wang, Qiang & Xiao Ruan, Phenolics and plant allelopathy, Molecules Basel Switzerland, 15 (2010) 8933.

35. Tang, Wing Zhong & Gobler, Christopher J., The green macroalga, Ulva lactuca, inhibits the growth of seven common harmful algal bloom species via allelopathy, Harmful Algae, 10 (2011) 480.

36. Leão, Pedro N., Teresa, M., Vasconcelos, S.D. & Vasconcelos, Vítor M., Allelopathy in freshwater cyanobacteria, Critical Reviews in Microbiology, 35 (2009) 271.

Foreign Direct Investment in India

Dipak Kumar Nath
Department of Commerce

Foreign direct investment (**FDI**) is a direct investment into production or business in a country by a company in another country, either by buying a company in the target country or by expanding operations of an existing business in that country. Foreign direct investment is in contrast to portfolio investment which is a passive investment in the securities of another country such as stocks and bonds.

Foreign direct investment has many forms. Broadly, foreign direct investment includes "mergers and acquisitions, building new facilities, reinvesting profits earned from overseas operations and intracompany loans".In a narrow sense, foreign direct investment refers just to building new facilities. The numerical FDI figures based on varied definitions are not easily comparable.

As a part of the national accounts of a country, and in regard to the national income equation Y=C+I+G+(X-M), I is investment plus foreign investment, FDI is defined as the net inflows of investment (inflow minus outflow) to acquire a lasting management interest ([illegible] percent or more of voting stock) in an enterprise operating in an economy other than that of the investor.FDI is the sum of equity capital, other long-term capital, and short-term capital as shown the balance of payments. FDI usually involves participation in management, joint-venture, transfer of technology and expertise. There are two types of FDI: inward and outward, resulting in a net FDI *inflow* (positive or negative) and "stock of foreign direct investment", which is the cumulative number for a given period. Direct investment excludes investment through purchase of shares.FDI is one example of international factor movements.

Types

1. **Horizon FDI** arises when a firm duplicates its home country-based activities at the same value chain stage in a host country through FDI.

2. **Platform FDI**
3. **Vertical FDI** takes place when a firm through FDI moves upstream or downstream in different value chains i.e., when firms perform value-adding activities stage by stage in a vertical fashion in a host country.

Horizontal FDI decreases international trade as the product of them is usually aimed at host country; the two other types generally act as a stimulus for it.

Methods

The foreign direct investor may acquire voting power of an enterprise in an economy through any of the following methods:

- by incorporating a wholly owned subsidiary or company anywhere
- by acquiring shares in an associated enterprise
- through a merger or an acquisition of an unrelated enterprise
- participating in an equity joint venture with another investor or enterprise

Foreign direct investment incentives may take the following forms:

- low corporate tax and individual income tax rates tax holidays
- other types of tax concessions
- preferential tariffs special economic zones

EPZ

- Export Processing Zones
- Bonded Warehouses
- Maquiladoras
- investment financial subsidies soft loan

- or loan guarantees
- free land or land subsidies
- relocation & expatriation
- infrastructure subsidies
- R&D support
- derogation from regulations (usually for very large projec

Importance and barriers to FDI

The rapid growth of world population since 1950 has occu mostly in developing countries. This growth has not been matche similar increases in per-capita income and access to the basic modern life, like education, health care, or - for too many - c sanitary water and waste disposal.

FDI has proven — when skillfully applied — to be one of t fastest means of, with the highest impact on, development. How given its many benefits for both investing firms and hos countries, and the large jumps in development were best practi followed, eking out advances with even moderate long-term impa often has been a struggle. Recently, research and practice are find ways to make FDI more assured and beneficial by continua engaging with local realities, adjusting contracts and reconfigur policies as blockages and openings emerge.

Foreign direct investment and the developing world

A recent meta-analysis of the effects of foreign dire investment on local firms in developing and transition countri suggests that foreign investment robustly increases local productiv growth.The Commitment to Development Index ranks th "development-friendliness" of rich country investment policies.

Difficulties limiting FDI

Foreign direct investment may be politically controversial o difficult because it partly reverses previous policies intended t protect the growth of local investment or of infant industries. Whe

these kinds of barriers against outside investment seem to have not worked sufficiently, it can be politically expedient for a host country to open a small "tunnel" as focus for FDI.

The nature of the FDI tunnel depends on the country's or jurisdiction's needs and policies. FDI is not restricted to developing countries. For example, lagging regions in the France, Germany, Ireland, and USA have for a half century maintained offices to recruit and incentivize FDI primarily to create jobs. China, starting in 1979, promoted FDI primarily to import modernizing technology, and also to leverage and uplift its huge pool of rural workers.

To secure greater benefits for lesser costs, this tunnel need be focused on a particular industry and on closely negotiated, specific terms. These terms define the trade offs of certain levels and types of investment by a firm, and specified concessions by the host jurisdiction.

The investing firm needs sufficient cooperation and concessions to justify their business case in terms of lower labor costs, and the opening of the country's or even regional markets at a distinct advantage over (global) competitors. The hosting country needs sufficient contractual promises to politically sell uncertain benefits—versus the better-known costs of concessions or damage to local interests. The benefits to the host may be: creation of a large number of more stable and higher-paying jobs; establishing in lagging areas centers of new economic development that will support attracting or strengthening of many other firms without costly concessions; hastening the transfer of premium-paying skills to the host country's work force; and encouraging technology transfer to local suppliers.

Concessions to the investor commonly offered include: tax exemptions or reductions; construction or cheap lease-back of site improvements or of new building facilities; and large local infrastructures such as roads or rail lines; More politically difficult (certainly for less-developed regions) are concessions which change policies for: reduced taxes and tariffs; curbing protections for smaller-business from the large or global; and laxer administration of regulations on labor safety and environmental preservation. Often

these un-politick "cooperations" are covert and subject to corr

The lead-up for a big FDI can be risky, fraught with re and subject to unexplained delays for years. Completion of the phase remains unpredictable — even after the contract cere are over and construction has started. So, lenders and investors high risk premiums similar to those of junk bonds. These co frustration have been major barriers for FDI in many countries.

On the implicit "marriage" market for matching investors recipients, the value of FDI with some industries, some comp and some countries varies greatly: in resources, manage capacity, and in reputation. Since, as common in such ma valuations can be mostly perceptual, then negotiations and follow are often rife with threats, manipulation and chicanery. For exa the interest of both investors and recipients may be serve dissembling the value of deals to their constituents. One result is the market on what's hot and what's not has frequent bubbles crashes.

Because 'market' valuations can shift dramatically in s times, and because both local circumstances and the global econo can vary so rapidly, negotiating and planning FDI is often q irrational. All these factors add to the risk premiums, and remo that block the realization of FDI potential.

Foreign direct investment by country

There are multiple factors determining host coun attractiveness in the eyes of large foreign direct institutio investors, notably pension funds and sovereign wealth fun Research conducted by the World Pensions Council (WPC) sugge that perceived legal/political stability over time and medium-te economic growth dynamics constitute the two main determinants.

Some development economists believe that a sizeable part Western Europe has now fallen behind the most dynamic among Asia's emerging nations, notably because the latter adopted polici more propitious to long-term investments: "Successful countri such as Singapore, Indonesia and South Korea still remember th harsh adjustment mechanisms imposed abruptly upon them by th

and World Bank during the 1997-1998 'Asian Crisis' What they achieved in the past 10 years is all the more remarkable: they quietly abandoned the "Washington consensus" [the dominant neoclassical perspective] by investing massively in infrastructure projects - this pragmatic approach proved to be very successful."

The United Nations Conference on Trade and Development said that there was no significant growth of global FDI in 2010. In 2011 was $1,524 billion, in 2010 was $1,309 billion and in 2009 was $1,114 billion. The figure was 25 percent below the pre-crisis average between 2005 and 2007.

Foreign direct investment in the United States

The United States is the world's largest recipient of FDI. U.S. FDI totaled $194 billion in 2010. 84% of FDI in the U.S. in 2010 came from or through eight countries: Switzerland, the United Kingdom, Japan, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands, and Canada.Research indicates that foreigners hold greater shares of their investment portfolios in the United States if their own countries have less developed financial markets, an effect whose magnitude decreases with income per capita. Countries with fewer capital controls and greater trade with the United States also invest more in U.S. equity and bond markets.

Foreign Direct Investment in China

FDI in China, also known as RFDI (renminbi foreign direct investment), has increased considerably in the last decade, reaching $59.1 billion in the first six months of 2012, making China the largest recipient of foreign direct investment and topping the United States which had $57.4 billion of FDI.

During the –global financial crisis FDI fell by over one-third in 2009 but rebounded in 2010.

Foreign Direct Investment in India

India today represents the most compelling investment opportunity for mass merchants and food retailers looking to expand

overseas. According to A.T. Kearney's annual global development index for 2010, Indian retail market totaling billion is vastly under served and has grown at an average rate of in the last 3 years. Present Government policy on FDI allows to presence of international brands through different routes Franchise, Joint Venture, Manufacturing, Distribution, Cash Carry. For Indian consumers the gradual and phase wise entry foreign companies involves 3 pivotal changes. 1) New Technology Improved Transperancy in trade 3) Sharing best practic.

Foreign players would displaced the unorganized because of their superior financial strengths indues unfair practices like predatory pricing, in the absence of proper regula guidelines, create monopoly and promote cartels, give rise to throat competition rather than promoting incremental busines Increas in real estate prices and marginalized domestic entrepreneu Hence checks are to be injected to ensure the overall growth of sm and big companies to create a level playing field for all.

FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN INDIAN RETAIL INDUSTRY

India is one of the largest budding markets, with a population over one billion. India is one of the bigged economies in the world terms of purchasing poewer. The market size of Indian retail indus is about US $312 billion Foreign direct investment has boomed post – reform India. Moreover, the composition and type of Foreig ditect investment has changed considerably since India has opene up to world markets. This has fuelled high expectations that forei direct incvestment may serve as channel to the higher econom growth of India. Foreign Direct Investment in trade has develope into the fresh theatre of war flank by the pro – reform and anti refor lobbies. Foreign investors are extremely eager on charisma in India retail sector. Incontrovertibly, foreign direct investment in retail budding as a sort of litmus trial to the government's pledge liberalization.

FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN INDIAN RETAIL INDUSTRY

Retailing is the largest private industry in India. It is mailnly divided into:

1) Organizaed and
2) Unorganized Retailing

1. Organized Retailing refers to trading activities undertaken by licensed retailers, that is, those who are registered for sales tax, income tax, etc. These include the corporate backed hypermarkets and retail chains, and also the privately owned large retail businesses.

2. Unorganized retailing, on the other hand, refers to the traditional formats of low – cost retailing, for example, the local kirana shops, owner manned general stores, convenience stores, hand cart and pavement vendors etc.

The Indian retail sector is highly fragment with 96 percent of its business being run by the unorganized retailers. The orgnized retail however is at a very nascent stage. The sector is the largest source of employment after agriculture, and has deep penetration into rural India generating more than 10 percent of India's GDP. The performance of this sector has a strong influnce on consumer welfare.

Retail trade in India

After globalization our economies have moved from social sector to capital sector and there is a great need of foreign capital or investment inour country. As our economy isgrowing and targeting 10% development rate, there is a great need of concentration on underdeveloped and potentially viable sector i.e. retail sector agriculture etc.

Retail trade in India and South East Asia

Countries Organized (%)Unorganized (%)

India 496 China 2080 South Korea 1585 Indonesia 257
Philippines 3565 Thailand 4060 Malaysia 5050

Source: CRISIL

Retailing in India is the largest private sector and second to agriculture in employment. India has highest retail outlet density – around 1.5 retail crore retail outlets. The retail sector contributes about 10 – 11% to Indian GDP and it is valed at an estimated Rs. 93,000 crore out of which organized retailing industry around Rs. 35,000 crore.

All major players such as Wal – Mart, Tesco, Sainbury and others are keen to enter the retail market. "A.K. Kearney" ranked India 5th out of 30 most attractive retail markets in terms of investment. Recently government has taken certain action to liberalize the retail market in India.

FDI Policy with Regard to Retailing in India

It will be prudent to look into Press Note 4 of 2006 issued by DIPP and consolidated FDI Policy issued in October 2010 which provide the sector specific guidelines for FDI with regard to the conduct of trading activities.

a) FDI up to 100% for cash and carry wholesale trading and export trading allowed under the automatic route.
b) FDI up to 51% with prior Government approval (i.e. FIPB) for retail trade of 'Single Brand' products, subjects to Press Note 3 (2006 series)
c) FDI is not permitted in Multi Brand Retailing in India.

Role of FDI in Indian retail trade

In January 2006, the Government relaxed FDI (foreign direct investment) controls on retailing to allow foreign retailers to

participate directly in the Indian market for the first tim by allowing equity ownership in 'Single Brand retailing. Thus foreign entities are now allowed to operate their stores, but only if they are single brand stores and only up to 51 percent ownership. The impact of the consequent increase in FDI, in Indian retail, is expected to not just develop strong backward linkages but also create a domestic supply chain of international standards. What is encouraging now for these global majors is the new policy thrust, which intends to further liberalize the FDI regim in Indian retail.

Though FDI in retail trade is as yet restricted, the Government of India has a more liberal policy towards wholesale trade, franchising, and commission agents services, thus preparing the ground for FDI in retail as well. Foreign retailers have already started operations in India through various routes:

1. Joint ventures where the Indian firm is an export house.
2. Franchising (eg. Kentucky Fried Chicken, Nike)
3. Sourcing of supplies from small scale sector
4. Cash and carry operations (Giant in Hyderabad, Metro in Bangalore).
5. Non – store formats – direct marketing (Amway)

Large international retailers of home furnishing and apparels such as Pottery Barn, The Gap and Ralph Lauren have made India one of their major sourcing hubs. Up to 100 percent FDI is allowed in 'Cash and Carry' operations. The Great Wholesaling Club Ltd is one such example. In February 2002, the world's largest retailer, Wal- Mart, opened a global sourcing office in Bangalore. In November 2006, it announced its entry under a joint venture with the Indian corporation Bharti. For the time being, Bharti is to own the chain of frontend retail stores, while the two firms will have an equal share in a firm that will engage in wholesale, logistics, supply chain and sourcing activities. This is seen as a preliminary step by Wal – Mart pending the removal of all restrictions of FDI in retail trade.

The source of the pressure for allowing FDI in retail

Why is the Government so keen in inviting FDI in retail sector? Let us look at some arguments made by the proponents of FDI:

1. "Only a few global firms possesses proprietary expertise in retail trade. They would not transfer their expertise to local firms unless they were allowed to operate in the domestic market." Reality: In the literature on retail, we could not trace the existence of any cutting edge proprietary expertise - either technical or managerial.

2. "The Government needs FDI to meet its foreign exchange requirements." Reality: Because of large capital inflows, the government of India is today burdened with huge and growing foreign exchange reserves. By April 13th , 2013 the foreign exchange reserves had swollen to $203 billion. The argument for FDI in retail to attract foreign exchange is not tenable.

3. "Only global retailers can satisfy the rising & varied demands of Indian consumers." Reality: It has yet to be shown which product or service is being offered by foregn retail firms is aunable at present to Indian customers or can not be provided without FDI. Moreover the alleged benefits of 'consumer choice' are being inflated. Indeed, the availability of excessively wide choice makes it so complex and time – consuming for the consumer to decide that it leads to stronger loyalty to particular brands! Research revelead that an average grocery store in USA, offers 35,000 to 40,000 stock keeping units versus 12,000 to 15,000 thirty years ago. The suppliers offer about 20,000 new items each year; of which 1,000 are new efforts and the rest are lying extensions. However, the top 5,000 items still account for about 90% of sales as they did 30 years ago.

Impact and benefits to the country

- Growth of infrastructure
- Franchising opportunity for local entrepreneurs

- Inflow of funds and investments
- Implementation of IT in retail
- Investment in Supply Chain, Cold Chain and Warehousing
- Increase in number and improved quality of employment
- Reduced cost and increased efficiency
- Provide better value to end customer, hence it wil leave to overall economic growth and create benchmark.

Conclusion:

Inward FDI has boomed in post-reform India. At the same time, the symphony and type of FDI has changed considerably. The above analysis shows that FDI has positive and negative effects on Indian economy. It can be concluded that to keep pace with the fore cast of Indian GDP, government should encourage Foreign Direct Investment. To avoid its negative impact on local player's regulatory framework should be redesigned. Government should encourage FDI on gradual basis like currently it is allowed for single brand.

India's retail sector remains off – limit to large international chains especially in multi – brand retailing. A number of concerns have been raised about opening up of the retail sector to FDI in India. The potential benefits from allowing large retailers to enter the Indian retail market may balance the costs. Proof from the US suggests that FDI in organized retail could help begin infaltion, particularly with wholesale prices it is also expected that technical know- how from foreign firms, such as warehousing technologies and distribution system, for example, will lend itself to improving the supply chain in India, especially for agricultural produce. India's experience between 1990 – 2010, particularly in the telecommunications and IT industries, showcases the various benefits of opening the door to large - scale investments in these sectors. Arguably, it is now the turn of retail.